আদ দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ

ফাতওয়া এবং গবেষণা পরিষদ

তাওহীদের নির্ধারিত পাঠ

(প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য)

প্রথম মুদ্রণ: ১৪৩৬ হিঃ

প্রারম্ভিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের রব আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সাহাবাদের প্রতি; এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহসানের সাথে যারা তাদের অনুসরণ করবে তাদের প্রতি। অতঃপর,

নিশ্চয়ই দ্বীনের মূল ভিত্তি ও খুঁটি হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং তাগুতকে অস্বীকার করা। কোন মানুষ দ্বীনের মূল বিষয়াবলী জানা ও মানা ব্যতীত সুশৃংখলভাবে ইসলামের পথে চলতে পারে না, এবং ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারে না এবং তার বিধান দ্বারা উপকৃত হতে পারে না।

আর তাওহীদ হল দ্বীনের মূল ও মজ্জা এবং দ্বীনের এমন ভিত্তি যার ওপর সমস্ত দ্বীন প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এটি বাস্তবায়ন ও এর বিপরীত বিষয় থেকে নিসম্পর্কতা ব্যতীত ঈমান পরিশুদ্ধ হবে না এবং কোন আমলও কবুল করা হবে না।

আর তাওহীদ মুসলিমদের সম্মানের মূল ভিত্তি ও তাদের শক্তি ও ঐক্যের মূল উৎস। এর মাধ্যমেই তারা আল্লাহর সাহচার্য এবং উত্তম সাহায্য লাভ করে; এবং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিরোধ, কর্তৃত্ব ও শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য পেয়ে সম্মানিত হয়।

কুফফার ও মুনাফিকরা দ্বীনের নিদর্শন মুছে ফেলতে ও তার প্রকৃত মূল্যবোধ বিকৃত করতে অপচেষ্টা চালিয়েছে যাতে তারা মুসলিমদেরকে তাদের ঐক্য ও শক্তির কেন্দ্রবিন্দু থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। তাই তারা তাদের তাগুতি এজেন্টদের কাছে দ্বীন বিকৃতি ও মুসলিমদের পাশ্চাত্যমুখী করণের মিশন প্রদান করেছে। ফলে তারা সত্যবাদী আলেমদের হত্যা ও কারারুদ্ধ করার মাধ্যমে সত্যের কন্ঠকে রুদ্ধ করার জন্য তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নিয়োগ করেছে। এবং তারা মুনাফিক ও বিভ্রান্ত আলেমদের গোমরাহী, আকিদা ও মানহাজগত বিকৃতি বিস্তারে সহযোগিতা করেছে।

এভাবে চলতে চলতে একপর্যায়ে সত্যের নিদর্শনটুকু যখন নিশ্চিহ্ন প্রায় তখন আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর জন্য এমন একদল লোককে নিয়োজিত করলেন যারা দ্বীনকে সংস্কার করবেন এবং আকিদাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন। ফলে তাঁরা স্পষ্টভাবে সত্যের ঘোষণা দিলেন, জিহাদের ঝান্ডাকে উড্ডীন করলেন এবং কাফের মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাদের খিলাফতে ইসলামিয়্যাহ প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা দান করলেন, যাতে তারা তাওহীদের বিলুপ্ত নিদর্শন পুনরুজ্জীবিত করছেন এবং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করে যাচ্ছেন।

আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহে এই বরকতময়, সৌভাগ্যপূর্ণ খিলাফতের ছায়ায় জীবনযাপন করছি। তবে এ খেলাফত স্থায়ী হওয়া ও টিকে থাকার জন্য আমাদের সত্যের প্রচার ও আহ্বান করা জরুরি যাতে এমন এক সত্যপন্থী মুওয়াহহিদ প্রজন্ম তৈরি হয় যাদের হাতে আল্লাহ এই উম্মাহর গৌরব ও মর্যাদা ফিরিয়ে আনবেন।

এ বইটি দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সংকলন যা আমরা শর'য়ী প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করেছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন এর দ্বারা আমাদের ও আমাদের সকল মুসলিম ভাইদের এবং বিশেষভাবে সকল মুজাহিদদের উপকার সাধন করেন।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর নিকট ঈমান

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহঃ তারা ঐ সকল লোক যারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং তাঁর সাহাবীগণ যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন হুবহু তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী। আর তাঁরা হলেন সাহাবা, তাবেয়ী, সুপথপ্রাপ্ত ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারী যারা যে কোন স্থান ও সময়ে বিদআত থেকে দূরে থাকেন ও সুন্নাহর অনুসরণের ওপর অবিচল থাকেন। এবং (ইনশাআল্লাহ) তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত সাহায্যপ্রাপ্ত ও অবশিষ্ট থাকবেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহর সাথে তাদের সম্পৃক্ত থাকা এবং কথা, কাজ ও বিশ্বাসে তাঁর সুন্নাহর বাহ্যিক ও অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণে তাদের একমত হওয়ার কারণে তাদের এই নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ঈমানের শাব্দিক অর্থ:

সত্যায়ন করা ও স্বীকৃতি দেয়া।

পারিভাষিক অর্থ:

জিহ্বায় স্বীকৃতি, অন্তরের বিশ্বাস ও অঙ্গ প্রতঙ্গের বাস্তবায়নকে ঈমান বলে। এটা বাড়ে ও কমে।

ইমাম আজরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"অন্তরের সত্যায়ন, মুখে স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের দ্বারা কাজে বাস্তবায়নকে ঈমান বলে। এ তিনটি গুণের সমন্বয় ব্যতীত কেউ মুমিন হতে পারে না।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"আমাদের সালাফদের মধ্যে যারা আমাদের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন, তাঁরা ঈমান এবং আমলের মধ্যে কোন পার্থক্য করতেন না। আমল ঈমানের অংশ এবং ঈমান আমলের অংশ। সুতরাং যে মুখে ঈমান আনবে, অন্তর দ্বারা উপলব্ধি করবে এবং আমলের মাধ্যমে সত্যায়ন করবে তা হবে তাঁর জন্য মজবুত বন্ধন যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর যে মুখে বলবে কিন্তু অন্তর দ্বারা উপলব্ধি করবে না এবং কাজের মাধ্যমে সত্যায়ন করবে না, সে কিয়ামতের দ্বীন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ২৫০)

প্রথম আবশ্যকীয় বিষয়

জেনে রাখো, আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন, সর্বপ্রথম যে বিষয়টি বান্দার জন্য শেখা ও আমল করা আবশ্যক তা হল তাগুতকে অস্বীকার করা এবং এক আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"অতঃপর যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে সে এমন মজবুত বন্ধন আঁকড়ে ধরবে যা বিচ্ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আল-বাকারাঃ ২৫৬)

এখানে তাগুতকে অস্বীকার করাকে অগ্রগামী করা হয়েছে, কেননা শিরক অপবিত্র। আর এ অপবিত্রতা যখন অন্তরের সাথে মিলিত হয় তখন তাকে তার স্বভাবজাত দ্বীন ও পবিত্রতা থেকে বের করে দেয়। আর তাওহীদ হল পবিত্রতম বস্তু; সুতরাং অন্তরের মধ্যে শিরকে আকবারের সাথে তাওহীদ একত্রিত হওয়া কখনো সম্ভব নয়। তাই অবশ্যই অন্তরকে প্রথমে শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ও নিষ্কলুষ করতে হবে, তারপর তাকে তাওহীদের পবিত্রতায় ভরপুর করতে হবে। তো যখন তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং তা হতে মুক্ত হবে, কেবল তখনই অন্তর তাওহীদ গ্রহণের উপযুক্ত হবে।

* কুফর বিত তাগুতের পদ্ধতি:

গায়রুল্লাহর ইবাদাত বাতিল হওয়ার বিশ্বাস করা ও তাকে ঘৃণা ও বর্জন করা এবং গায়রুল্লাহর ইবাদাতকারীদের কাফের বলা ও তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“বাতিল সমকক্ষ ও সমকক্ষ সাব্যস্তকারীদের সাথে প্রতি শত্রুতা, প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ব্যতিত ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। আর এ কারণেই আল্লাহ সকল রাসূলদের প্রেরণ করেছেন ও সকল আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। আর এই শিরকী ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাদের সাথে শত্রুতা করে তাদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন।” (আর রুহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪)

তাগুতের অর্থ ও তার প্রকার সমূহ:

الطاغوت على وزن فَعَلُوْت,

যা الطُّغْيَان তথা সীমালঙ্ঘন করা এ মূল ধাতু হতে উৎপন্ন। যখন কেউ সীমালঙ্ঘন করে তখন বলা হয়, ‘طَغَى’ অর্থ সে সীমালঙ্ঘন করেছে।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“তাগুত হল প্রত্যেক এমন ইলাহ কিংবা অনুসরণীয় বা মান্য ব্যক্তি যার ব্যাপারে বান্দা সীমালঙ্ঘন করে।

সুতরাং প্রত্যেক কওমের তাগুত হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ছেড়ে যার কাছে তারা বিচার পেশ করে অথবা আল্লাহকে ছেড়ে তারা যার ইবাদাত করে কিংবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার হেদায়াত ছাড়া যার অনুসরণ করে অথবা কোন বিষয় আল্লাহর আনুগত্য কিনা তা না জেনেই তারা যার আনুগত্য করে। সুতরাং এরা হল বিশ্বের তাগুতের দল। যদি তুমি তাদের অবস্থা চিন্তা কর ও তাদের সাথে মানুষের অবস্থা চিন্তা কর তাহলে দেখবে যে অধিকাংশ আল্লাহর ইবাদাত থেকে মুখ ফিরিয়ে তাগুতের ইবাদাতে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছে বিচার পেশ করা বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার পেশ করছে ও আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকে উপেক্ষা করে তাগুত ও তার অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়েছে।” (ইলামূল মুওয়াক্কিয়িন ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫০)

শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“তাগুত অনেক প্রকার কিন্তু তাদের মধ্যে বড় তাগুত পাঁচ প্রকারঃ

প্রথম:

গায়রুল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহবানকারী শয়তান।

দলীল: আল্লাহ বলেন,

“হে আদম সন্তান, আমি কি তোমাদের নিকট এ আদেশ প্রেরণ করি নি যে, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (ইয়াসিনঃ ৬০)

দ্বিতীয়:

আল্লাহর বিধান পরিবর্তনকারী জালিম শাসক।

দলীল: আল্লাহ বলেন,

“আপনি দেখেন নি তাদেরকে যারা দাবি করে যে তারা ঈমান এনেছে আপনার নিকট যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, তারা তাগুতের নিকট বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন তাদেরকে অস্বীকার করে। আর শয়তান তাদের সুদূর বিভ্রান্তিতে নিপাতিত করতে চায়।” (আন-নিসাঃ ৬০)

তৃতীয়:

যে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দ্বারা বিচার করে।

দলীল: আল্লাহ বলেন,

“আর যারা আল্লাহর বিধান দ্বারা বিচার করে না তারাই কাফির।”

(আল-মায়িদাঃ ৪৪)

চতুর্থ:

আল্লাহ ব্যতীত যে অদৃশ্য জ্ঞানের দাবী করে।

দলীল: আল্লাহ বলেন,

“(আল্লাহ) অদৃশ্যের জ্ঞানী, তিনি তাঁর অদৃশ্যের খবর কারো নিকট প্রকাশ করেন না। তবে যে রাসূলকে তিনি মনোনীত করেন তো তার সামনে পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন।” (জ্বীনঃ ২৬-২৭)

পঞ্চম:

আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় আর সে তার ইবাদাত করায় সন্তুষ্ট থাকে।

দলীল: আল্লাহ বলেন,

“আর তাদের মধ্যে যে বলবে যে, তিনি (আল্লাহ) ব্যতিত আমি ইলাহ তো তাকে আমি প্রতিদান দেবো জাহান্নাম। আর আমি অনুরূপভাবে জালিমদের শাস্তি দান করি।” (আল-আম্বিয়াঃ ২৯)

আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ হলো, এই বিশ্বাস করা যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অন্য ইলাহ ব্যতীত একমাত্র সত্য ইলাহ এবং সকল ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা। আর তিনি ব্যতীত সকল ইলাহদের অস্বীকার করা ও তাঁর একনিষ্ঠ বান্দাদের ভালোবাসা এবং বন্ধুত্ব পোষণ করা, মুশরিকদের ঘৃণা করা ও শত্রুতা পোষণ করা। এটাই মিল্লাতে ইবরাহীম; যে এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে নিজেকে নির্বোধ প্রমাণিত করবে আর এটাই হলো সেই আদর্শ, যার সংবাদ আল্লাহ দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে।

আল্লাহ বলেন,

“তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মাঝে। যখন তাঁরা তাদের কওমকে বললেন, ‘আমরা তোমাদের থেকে এবং তোমরা যাদের ইবাদাত করো তাদের থেকে সম্পর্কহীন। আমরা তোমাদের অস্বীকার করলাম এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে প্রকাশ পেল শত্রুতা ও ঘৃণা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে’।” (আল -মুমতাহিনাঃ ০৪)

তিনটি উসূল (মূলনীতি)

যার ব্যাপারে ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য আবশ্যক।

ইলম জাহালাতের বিপরীত; ইলম হলো: কোন জিনিস সম্পর্কে নিশ্চিত ও সুদৃঢ়ভাবে অবগত হওয়া।

শরিয়তের পরিভাষায়: প্রমাণাদিসহ সত্যকে জানা।

(الأصول)উসূল: এটা আরবি শব্দ আসল (أصل) এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ, কোন জিনিসের নিচের অংশ বা মূল ভিত্তি।

পরিভাষায়ঃ যার উপর অন্য কোন বিষয় নির্ভর করে।

আর এই তিনটি মূলনীতি হলো দ্বীনের মৌলিক নীতিমালা, যার দিকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের প্রত্যাবর্তন ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন যার শাখা। যে মূলনীতি মালা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বাণী থেকে আহরিত করা হয়েছে।

যেমন, মুসনাদে আহমাদে এসেছে - যার মূল সারাংশ বুখারী ও মুসলিমেও রয়েছে - যা বারা ইবনে আযীব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও অন্যান্য সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত। তারা বর্ণনা করেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে কবরের আযাবের দীর্ঘ হাদীস। তাতে রয়েছে, “অতঃপর একজন আগন্তুক আসবে; বলবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার নবী কে? অতঃপর সে বলবে আল্লাহ আমার রব। ইসলাম আমার দ্বীন। মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার নবী। অতঃপর সে তাকে বলবে, তুমি সত্য বলেছ। আর সেটাই সর্বশেষ ফিৎনা যা মুমিনের সামনে উপস্থিত করা হবে আর মুনাফিক ও সংশয় পোষণকারীরা বলবে, ‘হায়! হায়! আমি কিছুই জানি না। আমি

মানুষকে কিছু বলতে শুনেছি আমিও অনুরূপ বলেছি।' ফলে তাকে লোহার হাতুড়ি দিয়ে পেটানো হবে যা মানুষ ব্যতীত সবাই শুনতে পাবে। যদি মানুষ তা শুনত তবে অজ্ঞান হয়ে যেত।"

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আবশ্যক এই নীতিমালা শেখা, তা জানা, বিশ্বাস করা ও এর দ্বারা বাহ্যিক ও অস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয় সে অনুযায়ী আমল করা।

পরিচ্ছেদ

মূলনীতি তিনটি হলঃ

১। প্রথমত, বান্দার জন্য আবশ্যক হলো তার রব আল্লাহ তাআলাকে এমনভাবে জানা যেমনভাবে তিনি তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসে নিজের একত্ববাদীতানাম সমূহ, গুণাবলী ও তাঁর কর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন; তো তিনি সকল কিছুর রব ও অধিপতি। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ ও রব নেই।

২। তাঁর দ্বীনকে জানা, অর্থাৎ দ্বীনে ইসলাম, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অনুগত করেছেন।

দ্বীন শাব্দিক অর্থে: অবনত হওয়া, অনুগত হওয়া। যেমন, আরবীতে বলা হয়, অর্থাৎ আমি তাকে অনুগত করেছি ফলে সে অনুগত হয়েছে।

শরয়ী পরিভাষায়: ওই সকল বিষয়ের নাম, যার দ্বারা আল্লাহ সৃষ্টিকে তাঁর অনুগত করেছেন এবং তিনি তাদের তার উপর অবিচল থাকার আদেশ করেছেন।

সা'দী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"(দ্বীন) হলো গোপণে ও প্রকাশ্যে এক আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করা যেভাবে তাঁর রাসূলগণের ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।"

আর দ্বীনুল ইসলাম:

ওই সকল বিধান, আল্লাহ তাআলা যা তাঁর কিতাবে ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদীসে প্রদান করেছেন। তা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হোক বা কথার ক্ষেত্রে অথবা কাজের ক্ষেত্রে, প্রকাশ্য হোক বা গোপনীয়।

৩। তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে জানা। কেননা রিসালাত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা ও আমাদের মাঝে তিনিই একমাত্র মাধ্যম। আর তিনিই সৃষ্টির সেরা, তাঁর সম্মান ও মর্যাদার বর্ণনায় আয়াত ও হাদীস অসংখ্য। তাকে জানা ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা প্রত্যেকের ওপর ফরয। কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক আনীত বিধান ব্যতীত আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য আমাদের অন্য কোন পথ নেই।

আর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল, এই সাক্ষ্য দেয়া তাওহীদের ঘোষণার দ্বিতীয় অংশ যার দ্বারা একজন বান্দা দ্বীন ইসলামে প্রবেশ করে। আর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া ব্যতীত তাওহীদের সাক্ষ্যও সঠিক বিবেচিত হয় না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চেনা ও তার রিসালাতের ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা ব্যতিত ঈমান অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। আর তাতে আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, তার প্রদত্ত সংবাদে তাকে সত্যায়ন করা, তার আদেশে তাকে মান্য করা, তার নিষেধে বর্জন করা ও একমাত্র তার প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী আল্লাহর ইবাদাত করা।

পরিচ্ছেদ

“যখন তোমাকে বলা হবে, তোমার রব কে? তখন তুমি বলবে, আমার রব আল্লাহ, যিনি তাঁর অনুগ্রহে আমাকে এবং সমস্ত বিশ্বজগতকে লালন পালন করেন। তিনিই আমার ইলাহ, তিনি ব্যতীত আমার কোন ইলাহ নেই।”

রব হলেন সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও সকল কিছুর পরিচালনাকারী। তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক এবং তিনি সব কিছু পরিচালনা করেন। সুতরাং বিশ্বের বিন্দু পরিমাণ জিনিসও তার সৃষ্টি, মালিকানা ও পরিচালনার বাহিরে নয়।

শাব্দিক অর্থে ইবাদাত বলা হয়, পূর্ণ অবনত ও অনুগত হওয়ার পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ ভালবাসা। আর ইবাদাতের ভিত্তি ভালবাসা ভয় ও আশার উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“জেনে রেখো, হৃদয়ের স্পন্দন আল্লাহর নিকট তিন ধরনের, ভালবাসা, ভয় ও আশা।

আর তম্মধ্যে ভালবাসা হল সবচেয়ে শক্তিশালী আর একমাত্র তাই সত্তাগতভাবে কাম্য, কেননা তা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় স্থানে পাওয়া যায়, যা ভীতির বিপরীত। কেননা তা আখিরাতে দূরীভূত হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় থাকবে না এবং তাঁরা চিন্তিত হবে না।”

আর দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতি ভয় দ্বারা উদ্দেশ্য হল ধমকি এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হওয়া থেকে বাঁধা দেয়া। অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর পথে চলাকালে ভালবাসা বান্দার সাথে মিলিত হয় অতঃপর বান্দা ভালোবাসার দূর্বলতা ও সক্ষমতা অনুসারে তার দিকে ধাবিত হয়। আর ভয়-ভীতি বান্দাকে তার প্রিয় বস্তুর পথ থেকে বিচ্যুত হতে বাঁধা দেয় আশা তাকে টেনে নিয়ে যায়।

এটি অনেক বড় একটি মূলনীতি প্রত্যেকটি বান্দার তা লক্ষ্য করা জরুরি। কেননা এগুলো ব্যতীত সে গোলামী বা দাসত্ব অর্জন করতে পারবে না। আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যই আবশ্যক আল্লাহর বান্দা হওয়া তিনি ছাড়া আর কারো নয়।” (মাজমুউল ফাতওয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৯৩)

শরিয়াহর পরিভাষায় ইবাদাত:

আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, পছন্দ করেন এমন প্রত্যেক প্রকাশ্য-গোপনীয় কথা ও কাজের সমন্বিত নাম।

যেমন দুয়া, সালাত, ভয়, আশা, ভালবাসা এবং অন্যান্য ইবাদাত।

সুতরাং সকল ইবাদাত লা শরীক এক আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি এ জাতীয় কোন ইবাদাত গায়রুল্লাহর দিকে ফেরাবে সে কাফের মুশরিক।

“আর যখন তোমাকে বলা হবে তোমার দ্বীন কি? তখন তুমি বলবে আমার দ্বীন ইসলাম। আর ইসলাম হলঃ তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা ও আনুগত্যের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করা এবং শিরক ও তার ধারক-বাহকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।”

আত্মসমর্পন করা:

অর্থাৎ আল্লাহর সামনে অবনত ও বিনয়ী হওয়াতাওহীদের মাধ্যমে, যার অর্থ ইবাদাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে একক গণ্য করা। যেমন, আরবরা বলে, اِسْتَسْلَمَ فُلَانٌ لِلْقَتْلِ অমুক হত্যার জন্য আত্মসমর্পন করেছে। একথা তখন বলা হয়, যখন সে নিজকে অর্পণ করে, বশ্যতা স্বীকার করে এবং অনুগত ও অবনত হয়।

সুতরাং মুসলিম হলো একমাত্র আল্লাহ জন্য অনুগত, অবনত ও বশ্যতা স্বীকারকারী, অন্য সকলকে বাদ দিয়ে স্বেচ্ছায় একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী।

আর আনুগত্যের মাধ্যমে বশ্যতা স্বীকার করা:

অর্থাৎ শুধুমাত্র আত্মসমর্পিত ও অবনত হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং সাথে সাথে আল্লাহর আনুগত্য প্রদর্শনে, তাঁর সন্তুষ্টির আশায় এবং তাঁর নিকট যে পুরষ্কার রয়েছে তার প্রত্যাশায় এবং তাঁর শাস্তির ভয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নির্দেশকে মেনে নিতে হবে এবং নিষিদ্ধ বস্তু পরিত্যাগ করতে হবে।

শিরক ও তার ধারক-বাহকদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা:

আর তা হলো ছোট-বড় শিরক থেকে মুক্ত ও নিঃসম্পর্ক থাকা এবং শিরকের ধারকবাহকদের প্রতি শত্রুতা ও ঘৃণা প্রকাশ করে, তাদের কাফের বলে, তাদের সাথে বসবাস ও খাওয়া-দাওয়া না করে এবং কথা ও কাজে তাদের সাদৃশ্যতা অবলম্বন না করে তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা।

আর যখন তোমাকে বলা হবে, তোমরা নবী কে?

তখন তুমি বলবে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম। তাঁকে আল্লাহ বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী, আল্লাহর নির্দেশে তাঁর দিকে আহবানকারী ও প্রদীপ্ত বাতিরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তিনি সৃষ্টির মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ।

তিনি এমন বান্দা যার ইবাদাত করা যায় না এবং এমন রাসূল যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না। বরং তাঁর অনুসরণ ও আনুগত্য করতে হয়। আল্লাহ তাঁকে তাঁর গোলামী ও রিসালাত দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

সুতরাং প্রত্যেকের জন্য তাঁকে জানা, তাঁর প্রতি ঈমান আনা, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর আনুগত্য করা এবং তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা আবশ্যক।

পরিচ্ছেদ

তাওহীদ তিন প্রকার

প্রথম: তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ:

আল্লাহকে তাঁর কর্মের ক্ষেত্রে একক গণ্য করা। যেমনঃ সৃষ্টিকরা, রিযিক দেয়া, জীবন দেয়া, মৃত্যু দেয়া, কল্যাণ ও অকল্যাণ দান করা।

দলীল: আল্লাহর বাণী:

"(হে নবী!) আপনি বলুন,তোমাদের আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিযিক দান করেন অথবা কে শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির মালিক অথবা কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন ও জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন এবং কে বিষয়সমূহ পরিচালনা করেন? তো তারা অবশ্যই বলবে যে, আল্লাহ। তখন আপনি বলুন,তবে কি তোমরা ভয় করবে না? (ইউনুসঃ ৩১)

এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগের কুফফাররা তাওহীদের এই প্রকারকে মেনে নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু এর মাধ্যমে তারা ইসলামে প্রবেশ করতে পারে নি বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল ঘোষণা করেছেন। কেননা তারা ইবাদাতের ক্ষেত্রে শিরক করেছিল।

দ্বিতীয়: তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ: আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর বান্দাদের কাজে (অর্থাৎ ইবাদাতে) একক গণ্য করা। আর তা এমন এক বিষয় যাতে পূর্ব যুগ থেকে এ পর্যন্ত দ্বন্দ-বিভেদ চলে আসছে। যেমনঃ দুয়া করা, মান্নত করা, কুরবানী করা, আশা-আকাঙ্ক্ষা করা, ভরসা করা, ভয় করা, অভিমূখী হওয়া ও এ জাতীয় সকল কাজ যে ব্যাপারে কোরআনে দলীল রয়েছে।

আর তাওহীদুল উলুহিয়্যাহর প্রমাণ কুরআন ও সুন্নাহতে অনেক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সন্ন্যাসীদের এবং মাসিহ (ঈসা) ইবনু মারিয়াম -কে রব হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছে, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে তারা ইবাদাত করবে শুধুমাত্র এক ইলাহের, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চির পবিত্র তার তার সাথে যা শরিক করে তা থেকে।" (আত-তাওবাঃ ৩১)

আল্লাহ বলেন,

"আর তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নিষ্ঠাবান হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সরলপথপ্রাপ্ত উম্মতের দ্বীন।" (আল-বাইয়্যিনাহঃ ০৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"যে বলবে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ ব্যতীত যার ইবাদাত করা হয় তা অস্বীকার করবে, তাঁর সম্পদ ও রক্ত হারাম হয়ে যাবে। আর তার হিসাব হবে আল্লাহর নিকট।" (সহিহ মুসলিম)

তিনি আরো বলেন,

“যে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে, সে তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে শিরকযুক্ত অবস্থায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” (সহিহ মুসলিম)

তৃতীয়: তাওহীদুজ-জাত ওয়াল আসমা-ওয়াস সিফাত:

তা হলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা, এবং এ বিশ্বাস করা যে, তাঁর মহত্বের শান অনুযায়ী তাঁর সত্তা রয়েছে, যা মাখলুকদের সত্তার সদৃশ নয়; এবং আল্লাহর জন্য তাই সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন তাঁর কিতাবে এবং তাঁর রসূলের হাদীসে, নাম ও গুনাবলীর ক্ষেত্রে, তা'তীল (বাতিলকরা), তামছিল (সাদৃশ্যসাব্যস্তকরা), তাহরীফ (বিকৃতিকরা) এবং তাকঈফ (আকার প্রদান করা) করা ব্যতীত। আর আল্লাহ তাআলা নিজের জন্য তাঁর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের হাদীসে নিজ সত্তা থেকে যা নাকচ করেছেন তা নাকচ করা।

আল্লাহ বলেন,

“(হে নবী) আপনি বলুন,আল্লাহ তিনি এক। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তিনি জন্মও লাভ করেন নি।আর কেউ তাঁর সমকক্ষ নয়। (সূরা ইখলাসঃ ১-৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

“আর আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দর নামসমূহ, সুতরাং তাঁকে সেগুলো দ্বারা আহবান করো এবং ওই সকল লোকদের পরিত্যাগ করো, যারা তাঁর নামকে বিকৃত করে। তারা যা করে অচিরেই তার প্রতিদান পাবে।” (আল-আরাফঃ ১৮০)

আল্লাহ তাআলার আরো বাণী,

“তাঁর মত কোন কিছু নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (আশ-শুরাঃ ১১)

পরিচ্ছেদ

তাওহীদের বিপরীত শিরক

শিরক শব্দটি অংশীদারিত্ব ও অংশীস্থাপন শব্দদ্বয় থেকে গৃহীত, যা একটি বস্তুতে একাধিক ব্যক্তির অধিকার এবং শরীক থাকাকে বুঝায়।

পারিভাষিক অর্থে:

আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়্যাতে বা উলুহিয়্যাতে অথবা আসমা-ওয়াস সিফাতে (নাম ও গুনাবলীর ক্ষেত্রে) তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করা।

অথবা, তা হচ্ছে আল্লাহর কোন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তাআলার সমতুল্য করা।

* শিরক দুই প্রকার। যথাঃ (১) শিরকে আকবার বা বড় শিরক (২) শিরকে আসগর বা ছোট শিরক।

প্রথম প্রকার, শিরকে আকবার:

তা এমন অপরাধ যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না এবং এর সাথে কোন নেক আমল কবুল করেন না।

আল্লাহ বলেন,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো বিরাট পাপ উপার্জন করে।" (আন-নিসাঃ ৪৮)

তিনি আরও বলেন,

"নিশ্চয়ই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তিনিই ঈসা ইবনে মারিয়াম। আর ঈসা বলেন, 'হে বনী ইসরাইল! তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, যিনি আমার এবং তোমাদের রব। নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার অবস্থান হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই'।" (আল-মায়িদাঃ ৭২)

তিনি আরো বলেন,

"আর আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ মর্মে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করা হয়েছে যে, আপনি যদি শিরক করেন তাহলে অবশ্যই আপনার আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং আপনি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।" (আয–যুমারঃ ৬৫)

শিরকে আকবার তিন ভাগে বিভক্ত:-

১। রুবুবিয়্যাতে শিরক: যেমন কেউ বিশ্বাস করে যে, বিশ্ব জগতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কর্তৃত্ব রয়েছে অথবা বিশ্বাস করে যে স্রষ্টা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউ।

২। উলুহিয়্যাতে শিরক: ইবাদাতের কোন এক প্রকার গাইরুল্লাহর জন্য নিবেদন করা।

৩। আসমা ওয়াস সিফাতের (নাম ও গুনাবলীর) ক্ষেত্রে শিরক: যেমন গাইরুল্লাহকে আল্লাহর এমন নামে ডাকা যা একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশিষ্ট। অথবা আল্লাহর সাথে বিশিষ্ট গুনাবলীকে গাইরুল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা।

দ্বিতীয় প্রকার: শিরকে আসগর

এই প্রকারের শিরককারী যদি এ শিরক নিয়েই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে তবে সঠিক বক্তব্য অনুযায়ী সে আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে থাকবে, যদি আল্লাহ চান তাহলে তাকে ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আর তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে আযাব দেবেন। কিন্তু তার প্রত্যাবর্তন হবে জান্নাতে। কেননা শিরকে আসগরকারী জাহান্নামে চিরস্থায়ী হয় না। কিন্তু এটিও ধমকির একটি ক্ষেত্র তাই তা থেকে সতর্ক থাকা চাই।

শিরকে আসগার আবার দুইভাগে বিভক্ত:

১। প্রকাশ্য শিরকে আসগর: যেমন, গাইরুল্লাহর নামে কসম করা অথবা এই কথা বলা যে, "যা আল্লাহ চান ও আপনি চান।"

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

'যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে কসম করল সে শিরক করল।' (আহমাদ, আবু দাউদ, হাদিসটি সহিহ)

হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, মুসলিমদের থেকে একজন ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল যে, সে একজন আহলে কিতাবের লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছে তখন সে বলল, তোমরা কতইনা উত্তম জাতি যদি না তোমরা শিরক করতে, তোমরা বলো, যা আল্লাহ চান ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চান"। তখন ওই ব্যক্তি রাসূলের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, শোন, আল্লাহর কসম, তোমাদের বিষয়টি আমি আগেই জানতাম। তোমরা বল, যা আল্লাহ চান অতঃপর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চান। (আহমদ ও ইবনে মাজাহ, সনদ সহিহ)

২। গোপনীয় শিরকে আসগর: যেমন, রিয়া ও কুলক্ষণ নেয়া।

রিয়া অর্থ হলো মানুষের সামনে আমল প্রদর্শন করা। যা গৃহীত হয়েছে 'দেখা' শব্দ থেকে। এবং তার অর্থ মানুষ দেখুক এ কারনে আমলকে সুন্দর করা।

মাহমূদ ইবনে লাবীদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"আমি তোমাদের ওপর সবচেয়ে বেশি ভয় করি শিরকে আসগরের। সাহাবীগণ প্রশ্ন করলেন, 'শিরকে আসগার কি?' তিনি বললেন,'রিয়া'।" (আহমদ, সনদ হাসান)

এখানে রিয়া বলতে সামান্য রিয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা কোন ইবাদাতের মাঝে থাকে বা তার উপর হঠাৎ আপতিত হয়। আর যার পুরো আমলই রিয়া বা লোক দেখানো সে নিয়ত ও ইচ্ছার ক্ষেত্রে শিরকে পতিত; যা শিরকে আকবারের প্রকার। যা অতিশীঘ্রই ঈমান ভঙ্গের কারণ সমূহের প্রথম কারণের অধীনে আলোচনা করা হবে।

কুলক্ষণ নেয়া: অশুভ মনে করা, যা শুভ লক্ষণের বিপরীত। কুলক্ষণ নেয়ার অর্থ হলো কোন কাজ অথবা সফর করতে উদ্দ্যত হওয়া। অতঃপর কোন অপছন্দনীয় কিছু দেখে অশুভ মনে করে সে কাজ থেকে ফিরে আসা।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "কুলক্ষণ নেয়া শিরক।" (আহমদ, ইবনে মাজাহ, সনদ সহিহ)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "এই উম্মতের শিরক অন্ধকার রাতে কালো পাথরের ওপর কালো পিপিলিকার পদচারণার চেয়েও অস্পষ্ট। আর তার কাফফারা হলো এই দোয়া:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئاً وَأَنَا أَعْلَمُ ، وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنَ الذَّنْبِ الَّذِي لاَ أَعْلَمُ

অর্থ: হে আল্লাহ আমি জেনে-শুনে আপনার সাথে কোন শরীক করা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই। এবং আমি যে গোনাহের কথা জানি না সে গোনাহ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

(ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদে সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন)

পরিচ্ছেদ

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর শর্তাবলী

প্রথম,

তার সাব্যস্তকরণ ও নাকচকরণের অর্থের ব্যাপারে ইলম রাখা।

ইলম: কোন বিষয় বাস্তবতার সাথে সুদৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করা।

ইলম শর্ত করার দলীল:

আল্লাহর বাণী,

"সুতরাং (হে নবী!) আপনি জেনে নিন, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আপনার অপরাধের জন্য এবং সকল মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। আর আল্লাহ জানেন তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল ও আশ্রয়স্থল।" (মুহাম্মাদঃ ১৯)

তাঁর বাণী,

"তবে তারা ব্যতিত যারা হকের সাক্ষ্য দেয় এমন অবস্থায় যে তারা জানে। (আয-যুখরুফঃ ৮৬)

এখানে হক অর্থ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। "এমন অবস্থায় যে তারা জানে" অর্থাৎ তারা মুখে যা উচ্চারণ করেছে অন্তর দ্বারা তার অর্থ ও হাকীকত জানে।

হাদীস থেকে দলিল: সহিহ বুখারীর প্রমাণিত হাদীস হযরত উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

"যে মৃত্যু বরণ করবে এমন অবস্থায় যে সে জানে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

এ পবিত্র কালেমার দুটি রুকন রয়েছে,

সাব্যস্ত করা, নাকচ করা।

(লা ইলাহা [কোন ইলাহ নেই]) এটি আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতকৃত সকল ইলাহকে নাকচ করছে।

(ইল্লাল্লাহ [একমাত্র আল্লাহ ছাড়া]) এটি সকল প্রকার ইবাদাত শুধুমাত্র শরীক বিহীন এক আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে।

শুধু নাকচ করার নাম তাওহীদ নয় আবার শুধু সাব্যস্ত করার নামও তাওহীদ নয়। বরং নাকচ করা, সাব্যস্ত করা উভয়টিই জরুরি।

সুতরাং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ -এর অর্থ হলো, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। অর্থাৎ সবাইকে বাদ দিয়ে সকল প্রকার ইবাদতের হক্বদার কেবলমাত্র এক আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল ইলাহদের ইলাহ হওয়া সবচেয়ে বড় মিথ্যা ও ভ্রষ্টতা।

দ্বিতীয়,

দৃঢ় বিশ্বাস:

আর তা হচ্ছে কালিমার ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান যা সন্দেহ, সংশয়ের বিপরীত।

সুতরাং এ কালিমার পাঠকারীকে অবশ্যই এর উদ্দেশ্যের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস ধারণ করতে হবে যাতে কোন দ্বিধা বা সংশয় থাকবে না। কারণ ঈমানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দৃঢ় বিশ্বাসই কাজে আসবে। প্রবল ধারণাও কোন কাজে আসবে না। তো সংশয় থাকলে তা কিভাবে কাজে আসতে পারে? আমরা আল্লাহর কাছে এর থেকে পানাহ চাই।

দৃঢ় বিশ্বাস শর্ত করার দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"প্রকৃত মুমিন হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনে, অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে, এরাই হচ্ছে সত্যবাদী।" (আল-হুজরাতঃ ১৫)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার ক্ষেত্রে সংশয়হীনতাকে শর্ত করা হয়েছে। কেননা সংশয় পোষণকারী মুনাফিক।

হাদীস থেকে দলিল:

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। কোন সংশয় ছাড়া, যে ব্যক্তি এই দুটি কালিমা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (মুসলিম)

তৃতীয়,

ইখলাস বা একনিষ্ঠতা যা শিরকের বিপরীত।

ইখলাস শাব্দিক অর্থে:

পরিচ্ছন্ন করা, নিষ্কলুস করা, কোন জিনিসকে আলাদা করা, একক করা ও দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করা।

ইখলাসের মূল উদ্দেশ্য: আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের ইচ্ছাকে শিরকের সকল প্রকার আঁচ থেকে মুক্ত করা।

ইখলাস শর্ত করার দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"শোন, আল্লাহর জন্যই একনিষ্ঠ দ্বীন।" (আয-যুমারঃ ০৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

"আর তাদেরকে শুধু এই আদেশ করা হয়েছিল যে তারা দ্বীনকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নিষ্ঠাবান হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে, আর এটাই সরলপথপ্রাপ্ত উম্মতের দ্বীন।" (আল-বাইয়্যিনাহঃ ০৫)

হাদীস থেকে দলিল:

আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করে বলেন,

"আমার শাফায়াত লাভে সবচেয়ে বেশী সৌভাগ্যবান ওই ব্যক্তি, যে একনিষ্ঠ অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে।" (বুখারী)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"ইসলামের মূল হলো, এ সাক্ষ্য দেয়া যে 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল । আর যে ইবাদাত করে লোক দেখাতে চায় কিংবা খ্যাতির অন্বেষণ করে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করে নি।"

চতুর্থ,

(ঈমানের ক্ষেত্রে) সত্যবাদীতা যা মিথ্যার বিপরীত।

সত্যবাদীতা: অর্থাৎ কথা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া।

তাই অন্তর থেকে সত্যের সাথে এ কালিমা উচ্চারণ করতে হবে এবং অন্তর যবানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আর যদি কেউ মুখে প্রকাশ্যে তা উচ্চারণ করে কিন্তু গোপনে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে সে মুনাফিক। আর নিফাক হচ্ছে বিশ্বাসকে প্রকাশ করা এবং অবিশ্বাসকে গোপন করা অথবা ঈমানকে প্রকাশ করা কুফরকে গোপন করা।

সত্যবাদীতা শর্ত করার দলিল:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আলিফ লাম মীম। মানুষেরা কি ধারণা করে যে, এটুকু বলার কারণেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে যে, আমরা ঈমান এনেছি আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো সেসব লোকদেরও পরীক্ষা করেছি যারা তাদের আগে (এভাবেই ঈমানের দাবী করে) ছিল, অতঃপর আল্লাহ তাআলা অতিঅবশ্যই তাদের ভালো করে জেনে নেবেন যারা (ঈমানের দাবীতে) সত্য বলেছে, এবং জেনে নেবেন মিথ্যা দাবীদারদেরও।” (আল-আনকাবুতঃ ১-৩)

হাদীস থেকে দলিল:

সহিহাইনে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে মুয়ায ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণিত হাদীস,

“যে কোন ব্যক্তি অন্তর থেকে সত্যতা সহকারে সাক্ষ্য দেয় যে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর রাসূল, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন।”

পঞ্চম, ভালবাসা

ভালবাসা: কোন জিনিসের প্রতি অন্তরে ঝোঁক এবং তা পেয়ে স্বস্তি ও আনন্দ বোধ করা ।

অর্থাৎ তাওহীদের বাণী ও তা থেকে যা বোঝা যায় সকল বস্তুকে ভালবাসা।

আর এর বিপরীত হলো ঘৃণা করা অর্থাৎ কোন জিনিসের প্রতি অন্তরের বিরক্তি, দুরবর্তীতা ও অপছন্দ থাকা।

ভালবাসা শর্ত করার দলিল,

আল্লাহর বাণী,

“মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে, আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তাআলাকেই ভালোবাসা উচিত; আর যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনে, তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসে।” (আল-বাকারাঃ ১৬৫)

হাদীস থেকে দলিল:

সহিহাইনে হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“তিনটি বিষয় যার মধ্যে রয়েছে সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল, অন্য সবকিছু থেকে তাঁর নিকট বেশি প্রিয় হওয়া, কোন ব্যক্তিকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা, আল্লাহ তাআলা কুফরী থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করা যেভাবে সে অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে।”

ষষ্ঠ,

অনুগত হওয়া যা উপেক্ষা করার বিপরীত।

অনুগত হওয়া অর্থাৎ বিনয়ী হওয়া, অবনত হওয়া। যেমন আরবীতে বলা হয়, আমি তাকে অনুগত করেছি ফলে সে আমার অনুগত হয়েছে, এটা বলা হয় যখন সে আনুগত্য প্রদান করে।

এখানে উদ্দেশ্য হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য দাবীর এমনভাবে অনুগত হওয়া যা উপেক্ষা করার বিপরীত। অর্থাৎ উদ্দেশ্য হল তাওহীদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পন করা এবং আনুগত্যের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত কিতাব-সুন্নাহের সামনে অবনত হওয়া। আর তার পদ্ধতি হল আল্লাহর ফরজকৃত বিষয়ের উপর আমল করা ও নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করা এবং এর উপর অবিচল থাকা। এ আনুগত্য স্বীকার করা ব্যতিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা কোনই কাজে আসবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“যে নিজেকে সমর্পণ করে আল্লাহর কাছে এমন অবস্থায় যে সৎকর্মশীল সে মজবুত বন্ধন আঁকড়ে ধরে। (লোকমানঃ ২২)

মজবুত বন্ধন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ যেমনটি ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এবং ইবনে যুবায়ের (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন।

সপ্তম,

মেনে নেয়া যা প্রত্যাখ্যান করার বিপরীত।

আভিধানিক অর্থে মেনে নেয়া: অর্থাৎ কোন জিনিস পেয়ে সন্তুষ্ট থাকা।

আর এখানে উদ্দেশ্য হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তার দাবী ও তার উদ্দিষ্ট অর্থকে মুখে, অন্তরে ও সকল অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা এমনভাবে গ্রহণ করা যা প্রত্যাখ্যানের বিপরীত। এবং এই কালিমা ও তার কোন দাবীকে পরিত্যাগ না করা। কারণ এমন হতে পারে যে কেউ অর্থ জেনেই শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করবে কিন্তু অহংকার, হিংসা ও ইত্যাদি কারণে তার কোন দাবী মেনে নেবে না। তো সে মেনে নেয়ার শর্ত বাস্তবায়নকারীও বিবেচিত হবে না।

মেনে নেয়ার শর্ত করার দলিল,

আল্লাহর বাণী,

"এদেরকে যখন বলা হত, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তখন তারা অহংকার প্রদর্শন করত। এবং তারা বলত, 'আমরা কি একজন পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদের ছেড়ে দেব?" (আস-সফফাতঃ ৩৫-৩৬)

সুতরাং এই কালেমাকে যবান ও অন্তর উভয়ের দ্বারা মেনে নেয়া আবশ্যক। অতএব যে এটাকে মেনে নিবে না বরং প্রত্যাখ্যান করবে এবং এক্ষেত্রে অহংকার প্রদর্শন করবে সে কাফির। যেমন কুরাইশ কুফফাররা তা মেনে না নিয়ে একগুঁয়েমী ও অহংকারবশতঃ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

পরিচ্ছেদ

নাওয়াকিদুল ইসলাম বা ইসলাম ভঙ্গের কারণসমূহ

ইসলাম ভঙ্গের কারণ অনেক রয়েছে। আলেমগণ ফিকহের গ্রন্থে ধর্মত্যাগ অধ্যায়ে সেগুলো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) দশটি কারণ উল্লেখ করেছেন, কেননা এগুলোই মূলত বেশি সংঘটিত হয়।

আরবী নাওয়াকিদ শব্দটি নাকিদ শব্দের বহুবচন। আর তা সুদৃঢ় করা এর বিপরীত। নাকদ অর্থঃ খুলে ফেলা যেমন আরবীতে বলা হয় যে, সে বস্তুটিকে ভঙ্গ করল অর্থাৎ কোন কিছুকে মজবুতভাবে বাঁধা ও সুদৃঢ় করার পর খুলে দিল।

আর ভেঙ্গে ফেলা দুই রকম হতে পারে, ১.অনুভূত ২.অর্থগত

অনুভূত, যেমন দড়ি বা বেণী ভাঙ্গা।

অর্থগত, যেমন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, অযু ভঙ্গ করা।

আর এ (শব্দ ব্যবহারের) যৌক্তিকতা হল এভাবে যে, মানুষ যখন আদিষ্ট কাজ করে এবং তা নিজের উপর আবশ্যক করে নেয় তখন যেন তা একটি চুক্তি ও বাঁধন হয়ে যায়। তো যখন সে মৌলিকভাবে এর বিরোধী কোন কাজ করে সে যেন তখন সে বাঁধন খুলে ফেলে ও চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলে। এটি ওই শ্রেণীর ব্যাবহার যেখানে বুঝতে সহজ হবার জন্য অর্থগত বিষয়কে অনুভূত বিষয়ের সাথে তুলনা করা হয়।

আর মানুষ যখন তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করে তখন সে যেন, তার হক, আবশ্যকীয় বিষয় ও দাবী মেনে নেয়ারই চুক্তি করে। তারপর যখন মৌলিকভাবে এর বিরোধী কাজ করে তখন সে এ চুক্তি ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হয়।

পরিচ্ছেদ

ঈমান ভঙ্গের প্রথম কারণ:

আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা:

আল্লাহর ইবাদতে শিরক করার অর্থ হলো, ইবাদতের কোন এক প্রকার গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা। আর এটা হল বড় শিরক যা তাওবা ব্যতীত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। এ শিরককারী এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে।

আল্লাহ বলেন,

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না, তা ব্যতীত অন্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা করেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে তো বিরাট পাপ উপার্জন করে।” (সুরা নিসাঃ ৪৮)

তিনি আরও বলেন,

“নিশ্চয়ই যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন এবং তার অবস্থান হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।” (সুরা মায়িদাঃ ৭২)

অনুরুপভাবে আল্লাহর ইবাদাতে শরীক করার আরো উদাহরণ হল, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে যবাই করা যেমন- জ্বীন, কবরের জন্য যবেহ করা অথবা গায়রুল্লাহকে ডাকাডাকি করা অথবা কবর তাওয়াফ করা বা গায়রুল্লাহকে সিজদাহ করা।

*** ইবাদতের ক্ষেত্রে শিরক চার ধরনের হয়ে থাকে।**

প্রথম, ডাকার ক্ষেত্রে শিরক,

অর্থাৎ গায়রুল্লাহকে ডাকা এমন বিষয়ে যার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে; অথবা মৃতদের, মূর্তিদের, গাছ ও অনুরুপ ব্যক্তি বা বস্তুকে ডাকা অথবা অদৃশ্য কাউকে ডাকা।

ডাকা ও একটি ইবাদাত যে তা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করবে সে শিরক করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“নিশ্চয়ই মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং আল্লাহর সঙ্গে কাউকে ডেকো না।” (সুরা জ্বীনঃ ১৮)

ইমাম আহমদ ও সুনান গ্রন্থসমূহ প্রণেতাগণ নুমান ইবনে বাশীর থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“ডাকাও একটি ইবাদাত ।”

দ্বিতীয়, নিয়ত, ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক

দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন,

“যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মগুলো (-র ফল) দুনিয়াতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান করে দিই এবং দুনিয়াতে তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না। এরা এমনসব লোক যে,তাদের জন্যে আখিরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছিল তা সবই আখিরাতে বরবাদ হবে এবং যা কিছু করছে তাও বিফল হবে।” (সূরা হূদঃ ১৫-১৬)

নিয়ত ও সংকল্পের শিরক বিভিন্ন ইবাদাতের মধ্যে হয়ে থাকে । সুতরাং যে ব্যক্তি তার ইবাদাত করে দুনিয়া, সম্পদ, মর্যাদা, সুখ্যাতিবা অনুরূপ কিছু অর্জনের ইচ্ছা করে এবং আল্লাহর নির্দেশ পালন ও তাঁর নৈকট্য কামনা করে না, সে এই প্রকার শিরকের মধ্যে পতিত হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"আর ইচ্ছা ও সংকল্পের শিরকটি এমন সাগরের মত যার কোন তীর নেই এবং অল্প লোকই সেখান থেকে মুক্তি পায়। সুতরাং যে ব্যক্তি তার আমলের দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য ব্যতীত অন্য কিছু অনুসন্ধান করে আবার আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান আশা করে সে ইচ্ছা ও নিয়তের ক্ষেত্রে শিরককারী। আর ইখলাস হল নিয়ত, উদ্দেশ্য, কথা ও কাজ আল্লাহর জন্য বিশিষ্ট করা। এটাই হল ইবরাহীমের সরল মিল্লাত যা আঁকড়ে ধরার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রত্যেক বান্দাকে দিয়েছেন, যে মিল্লাত ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কারো থেকে কোন কিছু গ্রহণ করবেন না। আর এটাই হল ইসলামের প্রকৃত রূপ। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর যে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করবে, তার থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না, আর সে কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।"(আল-ইমরানঃ ৮৫)

(আল জাওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আনিন দাওয়া ইশশাফি, পৃঃ ১৩৫)

আর যে সকল কাজ ইবাদাতের অন্তর্ভূক্ত নয়, তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যেমন, কোন ব্যক্তির সম্পদ বা অন্য কিছুর আশায় কোন বৈধ কাজ করল।

তৃতীয়, আনুগত্যে শিরক,

দলিল: আল্লাহর বাণী,

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সন্ন্যাসীদের এবং মাসিহ (ঈসা) ইবনু মারিয়াম -কে রব হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছে, অথচ তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে তারা ইবাদাত করবে শুধুমাত্র এক ইলাহের, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি চির পবিত্র তার তার সাথে যা শরিক করে তা থেকে।" (আত-তাওবাঃ ৩১)

আদী ইবনে হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযি ও অন্যান্যদের বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ আয়াতের ব্যাখ্যা স্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ আয়াত পাঠ করতে শুনেন "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সন্ন্যাসীদের এবং মাসিহ (ঈসা) ইবনু মারিয়াম -কে রব হিসেবে গ্রহন করে নিয়েছে.............।" তখন তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বললেন, আমরা তো তাদের ইবাদাত করতাম না! তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "তারা যখন আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম করত তখন তোমরা কি তা হারাম করতে না? এবং যখন আল্লাহর হারামকৃত বিষয়কে হালাল করত তখন কি তোমরা তাকে হালাল করতে

না? (তিনি বলেন) তখন আমি বললাম, হ্যাঁ..। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, সেটাই তাদের ইবাদাত।"

ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে আবুল বুখতারী কতৃক হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করে এ আয়াত "তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের পন্ডিত ও সন্ন্যাসীদের এবং মাসিহ (ঈসা) ইবনু মারিয়াম -কে রব হিসেবে গ্রহন করেনিয়েছে।" এর তাফসীরে বলেন, "তারা তাদের ইবাদাত করে নি বরং অন্যায় কাজে তাদের আনুগত্য করেছিল।"

অন্য একটি বর্ণনায় বলেন,

"তারা যখন তাদের জন্য কোন বিষয় হালাল করত তখন তারা তাকে হালাল মনে করত। আর যখন তাদের জন্য কোন বিষয় হারাম করত তখন তারাও তাকে হারাম গন্য করত।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"এসকল লোকেরা যারা (আল্লাহ হারামকৃত বিষয়কে হালাল ও হালালকৃত বিষয়কে হারাম করার ক্ষেত্রে আনুগত্য করার মাধ্যমে) তাদের পন্ডিত এবং সন্ন্যাসীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল তারা দুই ধরনের হত:

প্রথম প্রকার, তারা জানত যে, তারা (পণ্ডিতরা) আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করে ফেলেছে। তা সত্বেও তারা এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ করত। এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাসূলের দ্বীনের বিরোধিতা করছে তা জানা সত্বেও তারা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনুসরণ করে তারা আল্লাহর হালালকৃত বিষয়কে হারাম ও হারামকৃত বিষয়কে হালাল মনে করত। এটা কুফর। যদিও তারা তাদের জন্য সালাত আদায় করত না, তাদেরকে সিজদাহ করত না তবু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল একে শিরক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন সুতরাং যে দ্বীনের বিরোধিতা জেনেও দ্বীনের বিরোধিতার ক্ষেত্রে অন্যের অনুসরণ করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেয়া বিধান ছেড়ে অন্যের রচিত বিধানে বিশ্বাস করবে সে তাদের মত মুশরিকে পরিণত হবে।

২।

أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال و تحليل الحرام ثابتا

কিন্তু আল্লাহর নাফরমানির ক্ষেত্রে তারা তাদের পণ্ডিতদের অনুসরণ করেছিল। যেমন মুসলিমরা অবাধ্যতা জেনেও আল্লাহর অবাধ্যতা করে। তো এদের বিধান হল পাপীদের বিধানের মত। (মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড-৭, পৃঃ৭০)

চতুর্থ, ভালবাসায় শিরক,

দলিল: আল্লাহ তাআলার বাণী,

“মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তাআলাকেই ভালোবাসা উচিত।” (আল-বাকারাঃ ১৬৫)

আর সেটা হল আল্লাহর সাথে অন্যকে আল্লাহর মতো ভালোবাসা অথবা তাঁর থেকে বেশি ভালোবাসা।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“আল্লাহর সাথে অন্যকে ভালবাসা দুই প্রকার।

এক, যা তাওহীদের মূলকে দূর্বল করে দেয় আর সেটা হল শিরক।

দুই, যা পূর্ণ ইখলাস ও আল্লাহর পরিপূর্ণ ভালোবাসার ক্ষেত্রে ঘাটতি সৃষ্টি করে কিন্তু ইসলাম থেকে বের করে দেয় না।

প্রথম প্রকার, যেমন, মূর্তি ও ইলাহদের প্রতি মুশরিকদের ভালবাসা।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

“মানুষের মাঝে কিছু সংখ্যক এমনও রয়েছে যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তাআলাকেই ভালোবাসা উচিত।” (সুরা বাকারাঃ ১৬৫)

এই সকল মুশরিকরা তাদের মূর্তি প্রতিমা ও ইলাহদের ভালবাসে আল্লাহকে ভালবাসার মতো। এ ভালবাসা ইলাহ ও অবিভাবকরূপে গ্রহণ করার ভালবাসা, যার অনুগামী হয় আশা, ইবাদাত, দুয়া। এধরনের ভালবাসা নিশ্চিত শিরক যা আল্লাহ ক্ষমা করেন না।

আর এ সকল বাতিল সমকক্ষ ও সমকক্ষ সাব্যস্তকারীদের সাথে প্রতি শত্রুতা, প্রচণ্ড ঘৃণা পোষণ করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ব্যতিত ঈমান পূর্ণ হতে পারে না। আর এ কারণেই আল্লাহ সকল রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, সকল আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন। আর এই শিরকী ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যারা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে ও তাদের সাথে শত্রুতা করে তাদের জন্য জান্নাত সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার, নফসের জন্য আল্লাহ যে সকল বস্তু সুশোভিত করে দিয়েছেন তা ভালবাসা যেমন, নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত ঘোড়া, চতুষ্পদ প্রাণী ও ফসল ইত্যাদি। তো এগুলোর প্রতি ভালবাসা প্রবৃত্তির পক্ষ হতে ভালবাসা। যেমন খাবারের প্রতি ক্ষুধার্তের এবং পানির প্রতি পিপাসার্তের ভালবাসা।

আর এই ভালবাসা তিন প্রকার:

যদি কেউ সেগুলো আল্লাহকে পাওয়ার মতো মাধ্যম হিসেবে ভালবাসে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আনুগত্য কামনা করে তাহলে সে সওয়াব লাভ করবে। আর তা আল্লাহকে ভালবাসার অন্তর্ভূক্ত যেহেতু তা

আল্লাহকে পাওয়ার জন্য। এবং তার স্বাদও সে উপভোগ করবে। আর এই তো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির (রাসূল) অবস্থা, দুনিয়া থেকে নারী ও সুগন্ধী তাঁর কাছে প্রিয় করে দেয়া হয়েছিল। আর এ ভালবাসা আল্লাহর ভালবাসা, রিসালাত পৌঁছানো ও দ্বায়িত্ব পালনে তাঁর সহযোগী হয়েছিল।

আর যদি কেউ সেগুলোকে নিজ প্রবৃত্তি ও ইচ্ছার অনুসরণে ভালবাসে আর যদি তাকেআল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির উপরপ্রাধান্যনাদেয় বরং প্রকৃতিগত ঝোঁকের কারণে তাকে ভালবাসে তাহলে তা মুবাহ পর্যায়ের হবে। এবং এর জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে না। কিন্তু আল্লাহর জন্যভালবাসার পূর্ণতায় কমতি ঘটবে।

আর যদি সেগুলোই হয় তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেগুলো প্রাপ্তিও উপার্জনের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালায় এবং সেগুলোকে আল্লাহর ভালবাসা ও সন্তুষ্টির ওপর অগ্রাধিকার দেয় তাহলে সে নিজের উপর জুলুমকারী ও প্রবৃত্তির অনুসারী সাব্যস্ত হবে।

তো প্রথমটি অগ্রগামীদের ভালবাসা।

দ্বিতীয়টি মধ্যপন্থীদের ভালবাসা।

আর তৃতীয়টি জালেমদের ভালবাসা। (আর রুহ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৫৪)

ইসলাম ভঙ্গের দ্বিতীয় কারণ, যে আল্লাহ এবং তাঁর মাঝে মধ্যস্থতাকারী বানাবে এমন অবস্থায় যে, সে তাদের ডাকাডাকি করে, তাদের নিকট সুপারিশ প্রার্থনা করে এবং তাদের ওপর ভরসা করে সে সকলের ঐক্যমতে কাফের হয়ে যাবে।

ইসলাম ভঙ্গের এই কারণটি সর্বাধিক সংগঠিত হয় আর এটি মানুষের জন্য অনেক আশংকাজনকও। কারণ অনেকেই যারা ইসলামের দাবী করে কিন্তু ইসলামকে জানে না এবং তার প্রকৃত রূপ চেনে না তারা আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার মাঝে মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করে এবং বিপদে, দুর্ঘটনায়, দুর্দশা মোচনে তাদেরকে আহ্বান করে। এ সকল লোকেরা মুসলিমদের ঐক্যমতে কাফির। কেননা আল্লাহ তাআলা জ্বীন ইনসানকে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আমি জ্বীন এবং মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” (আয যারিয়াহঃ ৫৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর মাঝে এমন মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করে যাদেরকে তারা আহ্বান করে, যাদের কাছে কামনা করে এবং বিভিন্ন প্রয়োজনে সাহায্য চায় সে আল্লাহর সাথে শিরককারী। তার মাঝে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রেরণের সময়ের মুশরিকদের মাঝে কোনই পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"জেনে রেখো, একনিষ্ঠ ইবাদাত আল্লাহ তাআলার জন্যেই। আর যারা আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে (তারা বলে) আমরা তো এদের ইবাদাত শুধু একারণে করি যে যাতে তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। নিঃসন্দেহে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে সে বিষয়ে আল্লাহ তাদের মাঝে ফায়সালা করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন না তাকে যে মিথ্যাবাদী ও কাফের। (আয-যুমারঃ ০৩)

ইসলাম ভঙ্গের তৃতীয়কারণ; যে মুশরিকদের কাফির মনে করে না বা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের মতবাদকে সঠিক মনে করে।

যে ব্যক্তি এ দোষে অভিযুক্ত তার উপর হুকুম লাগানোর পূর্বে কুফুরের প্রকার জেনে মাসআলাটি ভালোভাবে আত্মস্থ করে নেয়া জরুরী যে, কোন কাফিরকে কাফির না মনে করলে অথবা তার কুফুরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করলে মানুষ কাফের হয়ে যায়।

ওলামায়ে-কেরাম (রহিমাহুমুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরকে কাফির মনে না করলে অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এবং তারা এটাও বর্ণনা করেছেন যে, এই মাসআলা সর্বক্ষেত্রে প্রজোয্য নয়। বরং এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে। আর যে এই মাসআলার মূলনীতি ভালোভাবে না বুঝবে সে না বুঝেই ক্রমানুসারে লোকদের কাফির বলতে শুরু করবে।

 যে ব্যক্তি কাফিরকে কাফির না বলবে সে কাফিরের অবস্থা নাও জানতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তি জানেনা যে, অমুক ব্যক্তি কুফরী কথা বলেছে অথবা কুফরী কাজ করেছে। এরূপ হলে সে ওযরগ্রস্থ, সে এই মূলনীতির আওতায় আসবে না। একে বলা হয় অবস্থার অজ্ঞতা।

 আর যদি সে তার অবস্থা জানে তাহলে সে যে কাফিরকে কাফির বলে নি, অথবা তার কুফুরীতে সন্দেহ পোষণ করেছে অথবা তার মতবাদকে সঠিক বলেছে তার উপর বিবেচেনা করে তার উপর ফায়সালা দেয়া হবে।

সমষ্টিগত দিক থেকে কাফিররা দুই প্রকার,

এক, কাফিরে আসলী বা প্রকৃত কাফির যারা ইসলাম ধর্মের সাথে সম্পৃক্তই নয় এবং তারা দুই শাহাদাতের কালিমা উষ্চারণ করেনি। যেমন, ইহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক, হিন্দুও অন্যান্য কাফিররা।

এ জাতীয় কাফিরদের যারা কাফির বলবে না অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করবে সে ও কাফির। কেননা তাদের কুফরীর ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহে স্পষ্ট নস রয়েছে। এবং তা দ্বীনের সর্বজনবিদিত বিষয়। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদেরকে কাফির বলবে না হয়ত সে কুরআন সুন্নাহকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী অথবা ইসলামের মূল ও হাকীকত সম্পর্কে অজ্ঞ। আর এরকম অজ্ঞ লোকের ইসলামই সহিহ হয় না, কারণ সে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-র রোকনসমূহের মধ্যে একটি রোকনকে ছেড়ে দিয়েছে আর তা হলো ‘কুফর বিত তাগুত’।

আল্লামা আব্দুল্লাহ আবা বাতীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“সকল মুসলিমগণ ঐক্যমত পোষণ করেছেন ওই ব্যক্তির কুফরীর ওপর, যে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের কাফির বলে না অথবা তাদের কুফরীতে সন্দেহ পোষণ করে আর আমরা নিশ্চিত যে তাদের অধিকাংশই জাহেল। (রিসালাতুল ইন্তিসার)

দুই, ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত কাফির যে দুই শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করেছে কিন্তু এমন কুফরী কাজ করেছে যা তাকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয়।

স্পষ্ট ও অস্পষ্ট হওয়ার দিক থেকে এদের কুফরী কয়েক ভাগে বিভক্ত:

১। যার কুফরী প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট, কুরআন এবং সুন্নাহে যার সুস্পষ্ট প্রমান রয়েছে যেমন ঐ সকল মুশরিকরা (কবরপূজারীরা) যারা গায়রুল্লাহকে আহ্বান করে এবং তাদের ইবাদাত করে তাদের কাজ তাওহীদের মৌলিক শিক্ষা বিরোধী ও তার বিপরীত।আর যারা তাদের কাফির বলবে না তাদের দুই অবস্থা হতে পারে,

 হয় সে তাদের কাজ সঠিক মনে করবে এবং তাদেরকে স্বীকৃতি দেবে, তাহলে সে তাদের মতই কাফির। যদিও সে নিজে শিরক না করে কেননা সে শিরকী কাজকে সত্যায়ন করছে এবং স্বীকৃতি দিয়েছে। আর এটা কুফর, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

 অথবা সে বলবে তাদের কাজ কুফর এবং শিরক কিন্তু তাদেরকে কাফির বলবে না এই ব্যাখ্যা দিয়ে যে, তাদের মাঝে অজ্ঞতা রয়েছে। এই শ্রেণীর লোকদেরকে কাফির বলা যাবে না কেননা তারা তাদের কাজকে সঠিক বলেনি এবং সত্যায়ন করেনি বরং সেতাদের অজ্ঞতার কারণে ওযরগ্রস্থ হওয়ার সংশয়ে পতিত সুতরাং এ সংশয়ের কারণে তাকে কাফির বলা যাবে না। সংশয়ের কারণে যেহেতু হদই প্রয়োগ করা হয় না তাহলে তাকফীর তো প্রয়োগ না করার আরো বেশী উপযুক্ত। যে ব্যক্তির ইসলাম নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, কোন নিশ্চিত বিষয়ের মাধ্যেমেই সে ইসলাম বহির্ভুত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর তাদেরকে অজ্ঞতার কারণে ওযরগ্রস্থ মনে করা প্রাথমিকভাবে তাকে তাকফীর করতে বাঁধা দেবে। কিন্তু যখন তার কাছে নসসমূহ সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং তার সংশয় দূর হয়ে যাবে, তারপরও যদি সে তাদেরকে কাফির না বলে তাহলে সেও কাফির হয়ে যাবে।

কবর পূজারীদের কুফরীর ব্যাপারে যারা সন্দেহ পোষণ করে অথবা নিরবতা পালন করে অথবা অজ্ঞতার কথা বলে তাদের ব্যাপারে আল্লামা সুলাইমান বিন আব্দুল্লাহ বলেন,

“যদি কেউ তাদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে অথবা তাদের কুফরীর ব্যাপারে অজ্ঞতা পেশ করে তাহলে কুরআন ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ থেকে তার কাছে তাদের কুফুরীর প্রমান তুলে ধরা হবে তারপরও যদি সে তাদের কুফুরীর ব্যাপারে সন্দেহ বা সংশয় পোষণ করে তাহলে সে সকল আলেমদের ঐক্যমতে কাফির। কেননা যে কুফফারদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, সে কাফির।” (আওছাকু-উরাল-ঈমান জিমনা-মাজমুআতুত তাওহীদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৬০)

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল লতীফ আলে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“যে ব্যক্তি ইবাদতের কিছু বিষয় বান্দার জন্য সাব্যস্ত করবে অথবা এই বিশ্বাস করবে যে, যে ব্যক্তি এর পাশে দাঁড়াবে তার জন্য হজ্ব করতে হবে না, তার কুফুরীর ব্যাপারে ইসলামের সাথে যার নূন্যতম সম্পর্ক

রয়েছে সেও কোন সন্দেহ পোষণ করতে পারে না। আর যে এতে সন্দেহ পোষণ করবে তার কাছে প্রমাণ তুলে ধরতে হবে এবং বর্ণনা করতে হবে যে, এটা কুফুর ও শিরক। এবং এ পাথরগুলো গ্রহণ করার অর্থ আল্লাহর সে নিদের্শনাবলীর প্রতি স্পর্ধা প্রদর্শন করা যার সামনে অবস্থান করাকে আল্লাহ ইবাদাতরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতঃপর যদি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার অবস্থানে অনড় থাকে তাহলে তার কুফুরীর ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। (আদ-দুরার আস-সানিয়্যাহ, ১০/৪৪৩)

২। যার কুফুরীর ব্যাপারে সংশয় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিপরীত বিধান দিয়ে ফায়সালাকারী শাসক ও এ জাতীয় লোকেরা। প্রকৃত মাসআলা অন্বেষীদের কাছে যদিও তাদের কুফুরের বিষয়টি অকাট্য কিন্তু তবু তাতে সংশয় আসার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং যে তাদেরকে কাফির না বলবে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। তবে যদি তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় ও তার সংশয় দূর করা হয় এবং সে বুঝতে পারে যে তাদের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হল তাদের কাফির বলা তাহলে ভিন্ন কথা।

৩। যাকে কাফির বলা ইজতাহাদী মাসআলা ও তাতে মুসলিমদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে সালাত পরিত্যাগকারী ও এজাতীয় লোকদের বিধান। এ সকল মাসআলায় যারা এ জাতীয় লোকদের কাফের মনে করে না তাদের কাফির বলা যাবে না এমনকি বেদাতীও বলা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মূলনীতি থাকবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মূলনীতি।

ইসলাম ভঙ্গের চতুর্থ কারণ, যে বিশ্বাস করে যে অন্যের আদর্শ আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আদর্শ থেকে বেশি পরিপূর্ণ অথবা অন্যের ফায়সালা তাঁর ফায়সালা থেকে অধিক সুন্দর। যেমন যদি কেউ তাগুতদের বিধানকে তাঁর বিধানের উপর প্রাধান্য দেয় তাহলে সে কাফির।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমআর খুতবায় বলতেন,

"অতঃপর, নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম আদর্শ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) –এর আদর্শ।" (মুসলিম)

এটা জানা কথা যে নিশ্চয় দ্বীনুল ইসলাম দুটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত; কুরআন ও সুন্নাহ।

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)এর আদর্শ দ্বীনের স্বীকৃতি এবং সে অনুযায়ী আমল ও তার ব্যাখ্যা। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ ব্যতীত অন্য

আদর্শবেশি পরিপূর্ণ, সে দাবী করল ইসলাম ব্যতীত অন্য জীবন বিধান বেশি পুর্ণাঙ্গ। আর এটা মুসলিমদের ঐক্যমতে কুফর।

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের ওপর করুণা করেছেন এভাবে যে, তাদের জন্য দ্বীনকে পুর্ণাঙ্গ করে দিয়েছেন এবং নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, ইসলামকে তোমাদের দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) হিসেবে মনোনীত করে দিলাম।" (আল-মায়িদাঃ ০৩)

সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য যে দ্বীন মনোনীত করেছে তা পূর্ণাঙ্গ, সহজ ও শ্রেষ্ঠতম দ্বীন। আর এই দ্বীনকে যিনি পৌঁছে দিয়েছেন, ব্যাখ্যা করেছেন এবং আমলে বাস্তবরূপ দিয়েছেন তিনি হলেন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুতরাং তার আদর্শই হল দ্বীন। আর দ্বীন পরিপূর্ণ। সুতরাং -এর থেকে উত্তম ও পরিপূর্ণ দ্বীন ও আদর্শ পাওয়া যেতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন (জীবনবিধান) হলো ইসলাম।" (আল-ইমরানঃ ১৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (জীবনব্যবস্থা) তালাশ করবে তা তার কাছ থেকে কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ দের অন্তর্ভূক্ত হবে।" (আল ইমরানঃ ৮৫)

লেখক বলেন, "যে বিশ্বাস করবে যে, অন্যের ফায়সালা তাঁর ফায়সালা থেকে অধিক সুন্দর। যেমন যদি কেউ তাগুতদের বিধানকে আল্লাহর বিধানের উপর প্রাধান্য দিল......."

এটি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দিয়ে ফায়সালা করার মাসআলা। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দিয়ে ফায়সালা করে সমষ্টিগতভাবে তার ২ রকম অবস্থা হতে পারে:

(১) তার বিচারের মূল উৎসই হলো শরিয়াহ। এটা ব্যতীত অন্য কোন উৎস নেই। অতঃপর সে কিছু কিছু ক্ষেত্রে শরিয়াহ বিরোধী ফয়সালা দেয়।

(২) সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ শরয়ী বিধানকে পরিবর্তন করে অন্য বিধান দ্বারা এবং সেই বিধানকেই তার স্থলাভিষিক্ত করে যার মাধ্যমে শরয়ী বিধানকে অকার্যকর করে এবং তার স্থানে অন্য বিধান প্রণয়ন করে। চাই তা একটি বিধানের ক্ষেত্রে হোক বা একাধিক।

আর এই দুটি প্রকারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা অতিশীঘ্রই আলোচনা করা হবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“সকল বিধান বাদ দিয়ে একমাত্র আল্লাহর বিধান দিয়ে শাসন করা আর সকল ইলাহ বাদ দিয়ে একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদাত করা উভয়টি সমগোত্রীয়। যেহেতু দুই শাহাদাতের সারবত্তা হল, আল্লাহই হবেন একমাত্র ইলাহ, তাঁর কোন শরীক থাকবে না এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ই হবেন একমাত্র অনুসরণীয় ও তাঁর আনীত বিধানই হবে শুধু কার্যকর। তার আনীত বিধান অনুযায়ী আমল করা ও বর্জন করা এবং বিবাদের সময় তার কাছে বিবাদ উপস্থাপন করা একমাত্র এ সকল উদ্দেশ্যেই জিহাদের তরাবারি কোষমুক্ত করা হয়েছে।”

ইমাম শিনকিতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“বিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং তার ইবাদতে শরীক করা একই কথা। উভয়ের মাঝে কিছুতেই কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইন মেনে চলবে এবং আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানের অনুসরণ করবে, সে ওই ব্যক্তির মতো, যে মূর্তির ইবাদাত করে এবং প্রতিমাকে সিজদাহ করে। উভয়ের মাঝে কোনভাবেই কোন পার্থক্য নেই। তারা উভয়েই মুশরিক।” (আদওয়াউল-বায়ান লিশ শিনকিতী, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১০১)

আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ব্যতীত বিচার করা কখনো কখনো কুফরে আকবার হয় যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয় এবং কখনো কুফরে আসগার হয় যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দ্বারা ফায়সালাকারী নিম্নোক্ত অবস্থা থেকে মুক্ত নয়:

(১) মূলত আল্লাহর বিধান মেনে চলা কিন্তু ঘুষ, প্রবৃত্তি বা অন্য কোন কারণে কোন একটি ফায়সালায় আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দিয়ে ফায়সালা করা।

(২) নিজেই কিছু আইন প্রণয়ন করা এবং তা দিয়ে স্বেচ্ছায় বিচার ফয়সালা করা।

(৩) অন্যান্য সংবিধান থেকে আইন গ্রহন করা এবং স্বেচ্ছায় তা দিয়ে বিচার ফয়সালা করা।

(৪) পূর্ববর্তী বিচারকের নিয়ম-কানুন দ্বারা স্বেচ্ছায় বিচার ফয়সালা করা।

(৫) আল্লাহর শরিয়াহর বিরোধী আইন দ্বারা বাধ্য হয়ে বিচার ফয়সালা করা।

(৬) অজ্ঞতার কারনে আল্লাহর শরিয়ার বিরোধী আইন দিয়ে বিচার ফয়সালা করা।

* প্রথম অবস্থা: যে ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দিয়ে ফায়সালা করে এটা জানার এবং স্বীকার করার পাশাপাশি যে, আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দ্বারা বিচার ফয়সালা করা আবশ্যক। তবে ঘুষ খেয়ে কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মনে মনে নিজের দোষের কথা স্বীকার করে যদি শরীয়াহর বিধান থেকে সরে আসে এবং শরীয়াহ বিরোধী হুকুমকে যদি শরীয়াহর হুকুমের স্থলাভিষিক্ত

না বানায় তাহলে তার কুফুর কুফুরে আসগার বা ছোট কুফুর। এর দ্বারা সে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের হয়ে যাবে না।

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এর কথার এ ব্যাখ্যাই করতে হবে। কেননা তিনি তার কথা বলেছিলেন বনী উমাইয়্যার শাসন আমলে। আর বনু উমাইয়্যাহ শরীয়াহর বিধান দিয়েই বিচার ফয়সালা করত তবে তাদের কারো কারো থেকে বিচারের ক্ষেত্রে জুলুম প্রকাশ পেত। আর বনু উমাইয়্যাহ আল্লাহর শরীয়াহর পরিবর্তে শরীয়াহ বিরোধী কোন আইন প্রনয়ণ করে মানুষকে তা মানতে বাধ্য করে নি। মানবরচিত আইন দ্বারা শাসন প্রথম তাতারীদের যুগেই হয়েছে।

মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"আর যে বিচারকরা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তাদের কুফুরীর রয়েছে দ্বিতীয় প্রকার যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। আর ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, নিম্নোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস এর বক্তব্য এ প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়:

"যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।" (আল-মায়িদাঃ ৪৪)

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন,

"অর্থাৎ প্রকৃত কুফুর থেকে ছোট কুফুর"

তিনি আরো বলেন,

"এটা সে কুফুর নয় যে কুফুরের উদ্দেশ্য তোমরা করছো।"

আর এর ব্যাখ্যা হল বিচারকের প্রবৃত্তি বা মনের মন্দ ইচ্ছা তাকে কোন ফায়সালায় আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দিয়ে ফায়সালা করতে প্ররোচিত করবে পাশাপাশি তার এ বিশ্বাস থাকবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানই সত্য আর নিজের ব্যাপারে ভুল ও সত্য বর্জনের স্বীকৃতি দেবে। (আদ দুরারস্সস সুনিয়া, খন্ড১৬,পৃঃ ২১৮)

তিনি আরো বলেন,

"নিজে পাপী ও আল্লাহর বিধানই সত্য এ বিশ্বাস করার পাশাপাশি যখন আল্লাহর বিধান ব্যতীত ফয়সালা করে তখন যার ব্যাপারে বলা হয় যে, এটা ছোট কুফর তার থেকে এ জাতীয় বিষয় একবার বা তার অনুরূপবার প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু যারা প্রতিনিয়ত এটা করে এবং লোকদের তার অনুগত করার মাধ্যমে তাকে আইনে পরিণত করে তারা কাফির। যদিও তারা বলে যে,আমরা ভুল করছি বা শরিয়াহর বিধানই অধিক ন্যায়নিষ্ঠ।

(ফাতওয়া মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম, খন্ড১২, পৃ: ২৮০)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালা করা বিচারকের অবস্থার অনুপাতে ছোট বড় দুই ধরনের কুফরীই ধারণ করে। কারণ বিচারক যদি বিশ্বাস করে যে, এ

ঘটনায় আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে বিচার করা আবশ্যক, এবং (না করার কারণে) সে শাস্তির উপযুক্ত তবে তা ছোট কুফর।" (মাদারিজুস সালেহীন, খণ্ড ১, পৃঃ ৩৩৬)

শাইখ ইবনু ইবরাহীমের কথায় লক্ষ্যনীয় শব্দ হল,"কোন ফায়সালায়" , "একবার বা অনুরূপবার" এবং ইবনুল কায়্যিমের উক্তিতে লক্ষনীয় শব্দ হল "এ ঘটনায়"। এ শব্দগুলো প্রমান করে যে, যদি বিচারক আল্লাহর বিধানের বিপরীত বিধনাকে আবশ্যকীয়ভাবে নির্ধারণ করে তাহলে সে এই প্রকারের অর্থাৎ ছোট কুফরের আওতাভুক্ত হবে না বরং সে বড় কুফরের আওতাভূক্ত হবে।

* দ্বিতীয় অবস্থা: আর তা হলো নিজ থেকে আইন তৈরী করা এবং স্বেচ্ছায় তা দ্বারা ফয়সালা করা।

এটার ব্যাপারে হুকুম হলো, এটা কুফরে আকবর, যা তাকে মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দিবে। আর এর কারণ হল সে নিজের পক্ষ থেকে আইন রচনা করছে অথচ সে জানে যে আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে বিধান প্রদান করে ফায়সালা করে দিয়েছেন কিন্তু তা সত্বেও সে আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করে অন্য বিধান প্রণয়ন করেছে এবং লোকদেরকে তা মানতে বাধ্য করেছে। তো সে আল্লাহর সাথে বিধান প্রণয়ন করেছে এবং শাসন ক্ষমতা ও রুবুবিয়্যাতে আল্লাহর সাথে বিবাদ করেছে এবং নিজের সংকীর্ণ চিন্তা ও ভ্রান্ত মতামতকে আল্লাহ তাআলার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমতুল্য গণ্য করেছে।এটি "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই ও মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল" এ সাক্ষ্যের সুস্পষ্টতম লঙ্ঘন।

* আর তৃতীয় অবস্থা: অন্যান্য সংবিধান হতে আইন আহরণ করে স্বেচ্ছায় তা দিয়ে বিচার করাঃ

এর ব্যাপারেও হুকুম হলো, এটা কুফরে আকবার। কেননা সে অন্য আইন দ্বারা আল্লাহর আইনকে পরিবর্তন করেছে এবং অন্য বিধানকে অগ্রাধিকার দিয়ে আল্লাহর বিধানকে ফিরিয়েদিয়েছে। আর আইন নিজে তৈরী করা অথবা রহিত কোন গ্রন্থ থেকে অথবা অন্য কোন সংবিধান থেকে গ্রহণ করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই, কারণ আল্লাহর হুকুম পরিবর্তন করে বান্দাদের বিচার-ফায়সালার জন্য নির্ধারিণ করার দিক থেকে সবগুলো এক।

* চতুর্থ অবস্থা: যে পূর্ববর্তী বিচারকের আইন দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে বিচার করেঃ

এর ব্যাপারেও বিধান হলো, এটা কুফরে আকবার। কেননা আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য কোন বিধান প্রবর্তন করলেই কুফর হবে, তা তার নিজের রচিত হোক অথবা অন্য কারো হোক।

* পঞ্চম অবস্থা: বাধ্য অবস্থায় আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে বিচার করাঃ

আল্লাহর বিধান ব্যতীত বিচার ফয়সালাকারী যদি দাবী করে যে, সে বাধ্য তাহলে নিম্নলিখিত কারণে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(১) কারণ সে মুসলিমদের বিচারক হতে বাধ্য নয়। বরং তার জন্য আবশ্যক হচ্ছে সে বিচারকের পদ পরিত্যাগ করবে। আর যদি সে দাবী করে যে, সে বিচারকের পদ গ্রহন করতে বাধ্য, আর তা থেকে বিরত থাকার ক্ষমতা তার নেই,তবে সে এই বৃহৎ কুফরীতে লিপ্ত হওয়ার চাইতে নিহত হওয়াকে অগ্রাধিকার দেবে। কারণ আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধান দিয়ে মানুষের মাঝে ফায়সালা করা এবং তাদেরকে তাগুতের সে বিধানের অধীন করা ক্ষতির চেয়ে তার নিহত হওয়ার ক্ষতি অনেক কম। তার নিহত হওয়ার ক্ষতি তার নিজের মাঝেই সীমাবদ্ধ কিন্তু গাইরুল্লাহর বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করার ক্ষতি সর্বজনীন।

শাইখ সুলাইমিন বিন সাহমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যদি সকল শহরবাসী এবং গ্রামবাসীকে হত্যা করাও নিশ্চিত হয় তবু তা একজন যমীনের বুকে তাগুত প্রতিষ্ঠিত করার চাইতে সহজ হবে, যে ফায়সালা দেয় ইসলামের শরিয়াহর বিপরীত যার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে পাঠিয়েছেন।"

(২) তার নিজের কাজেই তার স্বাধীনতা নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের ফায়সালাই করতে সক্ষম নয় সে অন্যের ফায়সালা করতে পারবে না।

(৩) তাঁর (আল্লাহর) শরিয়াহ ব্যতীত অন্যের বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা মানুষদের কুফরীতে পতিত করার মাধ্যম, কারণ মানুষ যদি তাগুতের বিধান ও তাগুতের কাছে ফায়সালা পেশ করায় সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তারা কুফুরীতে পতিত হবে। আরদ্বীনের ভিতরে এমন ফিতনা সৃষ্টি করা হত্যা করা অপেক্ষা বেশি মারাত্মক।

(৪) শরিয়াহর বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করা ইবাদাত এবং শরিয়াহর কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়াও ইবাদাত। সুতরাং মানুষকে গায়রুল্লাহর ইবাদাতের জন্য এবং তার ফায়সালার কাছে নতি স্বীকার করতে ও মেনে নিতে বাধ্য করা জায়েয নেই।

ষষ্ঠ অবস্থা: অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর শরিয়াহ বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালা করা,

এই হুকুমটি আরোপের পূর্বে অবশ্যই জেনে নিতে হবে যে, অজ্ঞতা তাকফীরের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক সমূহের অন্যতম একটি প্রতিবন্ধক। কিন্তু এটি ব্যাপকভাবে নয়। কেননা অজ্ঞতা ওই ব্যক্তির জন্য ওযর যে নিজ থেকে অজ্ঞতা দূর করতে পারে না। যেমন- যে ইলম ও আলেমদের থেকে দূরবতী স্থানে অবস্থান করে অথবা নতুন মুসলিম এবং সে যে কুফুরীতে পতিত হয়েছে সে তা জানেই না। আর যদি সে অজ্ঞতা দূর করতে সক্ষম হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও তাতে কমতি করে তাহলে সে ওযরগ্রস্থ হবে না।

শাইখুল ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তর্কবিদদের প্রতিবাদে বলেন,

"(মানুষের উপর) রাসূলদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার দলীল জ্ঞান অর্জনের সক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর দলীল প্রতিষ্ঠা হওয়ার জন্য দাওয়াতপ্রাপ্তদের জানা শর্ত নয়। এ কারণেই কোরআন শোনা ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা থেকে কাফিরদের উপেক্ষা তাদের উপর আল্লাহর তাআলার প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হতে

বাঁধা সৃষ্টি করে নি। তেমনিভাবে নবীদের থেকে বর্ণিত ঘটনা ও তাদের জীবনকীর্তি পাঠ করা থেকে কাফিরদের উপেক্ষা তাদের উপর আল্লাহর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা হতে বাঁধা দেয় না। যেহেতু তাদের সক্ষমতা রয়েছে।" (মাজমু আল-ফাতওয়াঃ ১/১১২-১১৩ পৃঃ)

সতর্কতাঃ কুফরকারীর ক্ষেত্রে কুফরের হুকুম দেওয়ার জন্য বিষয়টি কুফর কিনা তা জানা শর্ত নয়। কেবলমাত্র এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তা নিষেধ করেছেন।

সুতরাং যদি কেউ জানে যে, আল্লাহ কোন বিষয়কে হারাম করেছেন তবে সে এটা জানে না যে,তা কুফর, তবে সে এ কাজ করার দরুন কাফির হয়ে যাবে যদিও সে না জানে যে, তা কুফুর। এ ব্যাপারে অনেক দলীল রয়েছে তার মধ্য থেকে কিছু দলীল নিম্নে দেয়া হলোঃ

 নিশ্চয়ই যারা সাহাবীদেরকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করেছিল তারা জানতো যে, তাদের এ কাজ হারাম কিন্তু তারা এটা জানতো না যে তা কুফুর। তা সত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদের ব্যাপারে কুফরীর হুকুম দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

"তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে, 'আমরা তো একটু অযথা কথাবার্তা ও হাসি কৌতুক করছিলাম মাত্র', তুমি (তাদেরকে) বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ তাআলা, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রুপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না, ঈমান আনার পর তোমরা পুণরায় কুফরী করেছ।"(আত-তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

 সালামাহ ইবনু ছখর বায়াদী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জানতেন যে, রমযানের দিবসে স্ত্রী সহবাস হারাম কিন্তু তিনি এটা জানতেন না যে, এ নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য কাফফারা আবশ্যক হয়। যখন তিনি তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হলেন তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর নিকট এলেন এবং জানালেন, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার জন্য কাফফারাকে আবশ্যক করে দিলেন। তার না জানার কারণে কাফফারা বাদ দিয়ে দেন নি।

ইসলাম ভঙ্গের পঞ্চম কারণ, যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত বিধানের কোন কিছুকে ঘৃণা করে, তবে সে কাফির যদিও সে তা অনুযায়ী আমল করে।

আর এটি প্রমাণিত আলেমদের ঐক্যমতের দ্বারা যেমন "আল ইকনা" কিতাবের লেখক ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

যারা আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করে, তাদের কুফুরীর বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

"যারা কুফরী করেছে তাদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দেবেন। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন।" (মুহাম্মদঃ ৮-৯)

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত কোন বিষয়, তা কথা হোক বা কাজ তাকে ঘৃণা করা, বিশ্বাসগত নিফাকের অন্তর্ভুক্ত যে নিফাক মানুষকে জাহান্নামের নিম্নস্তরে নিয়ে যায়।

দ্বীনের কোন বিষয়কে ঘৃণা করার দুটি রূপ:

১। কোন বিধান প্রণয়নের কারণে দ্বীনের সে বিষয়কে ঘৃণা করা, তাহলে তা কুফর।

২। কোন বিধান প্রণয়নের কারণে দ্বীনের সে বিষয়কে ঘৃণা করে না, বরং দ্বীনের বিধান সত্য তা জানা ও স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও স্বভাবগত কারণে তাকে অপছন্দ করে। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

"তোমাদের ওপর ক্বিতাল ফরয করা হয়েছে যদিও তোমাদের নিকট তা অপছন্দনীয়।"

তা অপছন্দনীয়, কারণ তাতে মানুষ নিহত হয়,

এবং সে ওই ব্যক্তির মতো যে যাকাত দিতে অপছন্দ করে তার কৃপনতার জন্য, শরয়ী হুকুমের প্রতি ঘৃণাবশতঃ নয়। তো এই জাতীয় লোকদের কাফির বলা যাবে না।

ইসলাম ভঙ্গের ষষ্ঠ কারণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীনের কোন বিষয় অথবা কোন প্রতিদান বা শাস্তিকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

এর দলীল: আল্লাহ তাআলার বাণী,

"তুমি যদি তাদের জিজ্ঞেস করো, তারা বলবে, 'আমরা তো একটু হাসি তামাশা করছিলাম মাত্র', তুমি (তাদেরকে) বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ তাআলা, তার আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা ওযর পেশ করো না, তোমরা ঈমান আনার পর তোমরা পুণরায় কুফুরী করেছ।" (আত-তাওবাঃ ৬৫-৬৬)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত কোন বিষয়কে ঠাট্টা করা, সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে কুফর; যদিও তা প্রকৃতপক্ষে ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে না হয়, যেমন মজা করে কোন কথা বলা।

ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও আবু শাইখ সহ অন্যান্যরা আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণনা করেন,"জনৈক ব্যক্তি তাবূক যুদ্ধে কোন এক মজলিসে বলল, 'এই পড়ুয়াদের মতো অধিক পেটুক, মিথ্যাবাদী ও যুদ্ধের ময়দানে অত্যাধিক কাপুরুষ কাউকে দেখিনি'। সে মজলিসের এক ব্যক্তি বলল, 'তুমি মিথ্যা বলেছো, বরং তুমি মুনাফিক। আমি অবশ্যই রাসূল (সাল্লাল্লাহুআলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এ ব্যাপারে বলে দেব'। অতঃপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে এ

সংবাদ পৌঁছে গেল এবং এ ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ হলো। আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ‘অতঃপর আমি ওই মুনাফিককে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর উটের কোমরবন্দ ধরে রয়েছে আর পাথর তাকে ক্ষত-বিক্ষত করছে আর সে বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো শুধু হাসি-তামাশা করছিলাম’। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলছেন,“তোমরা কি আল্লাহ,তাঁর নিদের্শনাবলীও তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে?”

তো তাদের এ বক্তব্য,“আমরা তো শুধু হাসি-তামাশা করছিলাম” অর্থাৎ আমরা প্রকৃত অর্থে ঠাট্টা করছিলাম না বরং আমরা কেবল মাত্র মজা করছিলাম, যাতে পথের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় যেমন এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কাফির সাব্যস্ত করেছেন। কেননা এ ক্ষেত্রে কোন হাসি-তামাশা চলে না। তাই তারা এ কথার কারণে কাফিরে পরিণত হয়েছিল, যদিও ইতিপূর্বে তারা মুমিন ছিল।

আর ঠাট্টা দু ধরনের হয়ে থাকে:-

১। দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা, যেমন সালাত, আযান, বা এ জাতীয় কোন বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করা যেগুলো ইসলামের সুস্পষ্ট নিদর্শন। তো এটা স্পষ্ট কুফুরী।

২। ওই ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করা, যে সুন্নাহর অনুসরণ করে ও শরিয়াহ অনুযায়ী আমল করে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে দুটি অবস্থা:-

(ক) সুন্নাহর অনুসরণ করা ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করার কারণে তার সাথে বিদ্রুপ করা। এ বিদ্রুপ দ্বীনকে নিয়ে বিদ্রুপ করার নামান্তর।

(খ) কোন ব্যক্তিকে নিয়ে ঠাট্টা করা - তবে তার দ্বীনি ও সুন্নতী আকৃতির কারণে নয় -। এ জাতীয় ঠাট্টা ফাসেকী। কুফুরী নয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা: প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল আল্লাহর দ্বীন এবং রাসূলের আনীত বিধান নিয়ে বিদ্রুপকারীদের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা যদিও তারা তার নিকটবর্তী লোক হয়। এবং তাদের সাথে উঠা-বসা না করা যাতে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়।

যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

“এবং নিশ্চয়ই তিনি কিতাবের মাঝে তোমাদের উপর প্রত্যাদেশ করেছেন যে, যখন তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি অবিশ্বাস করতে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুনবে, তখন তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা অন্য আলোচনায় লিপ্ত না হয়। অন্যথায় তোমরাও তাদের মতো হয়ে যাবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সমস্ত মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।” (আন-নিসাঃ ১৪০)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করতে ও ঠাট্টা করতে শুনে, তারপরও সে তাদের সাথে বসে থাকে এবং পৃথক না হয় তবে কুফুরী ও ইসলাম থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে সেও তাদের সমান।

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“একত্র করো তাদেরকে যারা নিজেদের উপর অবিচার করেছে এবং তাদের যুগলদেরকে।” অর্থাৎ তাদের সমকক্ষ ও সাদৃশপূর্ন লোকদেরকে।

ইসলাম ভঙ্গের সপ্তম কারণ: যাদু করা। আর কাউকে কিছু থেকে ফেরানো ও কোন কিছুর প্রতি আগ্রহী করা যাদুরই প্রকার। যে ব্যক্তি যাদু করবে বা যাদুতে সন্তুষ্ট থাকবে সে কাফির হয়ে যাবে।

দলীল এ আয়াত,

“তারা তার (যাদুর) মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারে না আল্লাহ আদেশ ব্যতীত। আর তারা শিখতো যা তাদের ক্ষতি করবে উপকার করবে না।” (সূরা বাকারাঃ ১০২)

যাদু: শাব্দিক অর্থে যার কারণ সুক্ষ্ম ও গোপনীয় তাকে যাদু বলে।

শরিয়াহর পরিভাষায়: এমন কিছু গিট ও ঝাড় ফূঁক করা, যাদুকর যার মাধ্যমে শয়তানের সাহায্য নিয়ে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির ক্ষতি করে থাকে।

যাদুর পরিচয়ে অন্য কিছুও বলা হয়ে থাকে।

ইমাম শিনকীতি (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“জেনে রাখো যাদুর কোন সর্বজনীন পরিচয় দেয়া সম্ভব নয়। কারণ যাদুর অনেক প্রকার রয়েছে যেগুলোর মাঝে এমন কোন যৌথ অর্থ পাওয়া যায় না যা সকল প্রকারের জন্য সর্বজনীন হবে এবং অন্য

কিছুকে যাদুর অন্তর্ভুক্ত হতে বাঁধা দেবে। এ কারণেই যাদুর পরিচয় নিয়ে উলামাদের বক্তব্যের মাঝে বিরাট মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়।"

* যাদুর বাস্তবতা রয়েছে। আর এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহর মত। যা মুতাযিলাদের বিপরীত।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এটি (মুতাযিলাদের মত) সালাফ ও সাহাবাদের থেকে মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত মতের বিপরীত। এবং এটি ফকিহ, মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও অন্তর্জ্ঞানের অধিকারী সূফিগণ যে ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন, এবং অধিকাংশ যুক্তিবিদগণ যা জানেন তার বিপরীত। আর যাদু যা রোগব্যাধি, সংকট, সমাধান, বন্ধন, ভালবাসা, ঘৃণা ও ধোঁকা দেয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে, তার অস্তিত্ব রয়েছে, এটা সাধারণ মানুষও জানে। (বাদাইউল ফাওয়ায়েদ ২/২২৭)

আর যাদুর প্রকার হল কাউকে কিছু থেকে ফেরানো ও কোন কিছুর প্রতি আগ্রহী করা,

কিছু থেকে ফেরানো: অর্থাৎ কাউকে তার প্রিয় বস্তু থেকে ফেরানো। যেমন কোন লোককে তার স্ত্রীর ভালোবাসা থেকে ঘৃণার দিকে ফিরিয়ে দেয়া।

আগ্রহী করা: এটিও ফেরানোর মতই যাদুকরী কাজ। কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হল তা শয়তানী পন্থায় মানুষকে তার অপছন্দনীয় বস্তুর ভালোবাসার প্রতি প্ররোচিত করে।

যাদুকরের বিধান; যাদুকর কাফির কিনা এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য রয়েছে।

গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) এর কথার বাহ্যিক দাবী হল সে কাফির হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

"আর তারা দুজন কাউকে (যাদু) শিক্ষা দিত না যতক্ষণ না তারা এ কথা বলত যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।"

এটাই ইমাম আহমাদ ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানিফা (রহিমাহুমুল্লাহ) এর মত। এবং অধিকাংশ আলেমই এ মত পোষণ করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহিমাহুল্লাহ) মনে করেন যে, যদি কেউ যাদু শিখে তবে তাকে বলা হবে, তুমি তোমার যাদুর বর্ণনা দাও। যদি সে এমন কিছু বলে যা কুফুরীকে আবশ্যক করে তাহলে সে কাফির। আর যদি কুফুরের পর্যায়ে না পৌঁছে তাহলে সে কাফির নয়।

আল্লামা শিনকিতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"এই বিষয়ে প্রকৃত কথা হলো উভয় অবস্থার মাঝে পার্থক্য করা। যদি যাদুতে গাইরুল্লাহকে বড় করা হয়, যেমন তারকা, জ্বীন, এবং অন্যান্য বিষয় যা কুফরীর দিকে ধাবিত করে তাহলে তা কোন প্রকার দ্বিমত ছাড়াই কুফর। আর এই প্রকারের যাদু হারুত, মারুতের যাদু যা সূরা বাকারায় উল্লেখিত হয়েছে। এটা নিশ্চিত কুফর যাতে কোন দ্বিমত নেই। যেমনঃ আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আর সুলাইমান কুফরী করে নি কিন্তু শয়তানেরা কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত।"

আল্লাহ আরো বলেন,

"আর তারা দুজন কাউকে (যাদু) শিক্ষা দিত না যতক্ষণ না তারা এ কথা বলত যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষাস্বরূপ। সুতরাং তোমরা কুফরী করো না।"

আল্লাহ আরও বলেন,

"তারা অবশ্যই জানত, যে তা (যাদু) গ্রহণ করবে আখিরাতে তার কোন হিসসা থাকবে না।"

(আল-বাকারাঃ ১০২)

তিনি আরো বলেন,

"আর যাদুকর যেখানেই আসুক সে সফলতা লাভ করতে পারে না। (ত্ব-হাঃ ৬৯)

আর যাদু যদি কুফুরীকে আবশ্যক না করে, যেমন, তেল বা এ জাতীয় বস্তুর বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাহায্য নেয়া। এটি জোরদারভাবে নিষিদ্ধ তবে তা ওই ব্যক্তিকে কুফর পর্যন্ত পৌঁছে দেয় না।"

জেনে রেখো, সঠিক মত অনুযায়ী উভয় অবস্থায়ই যাদুকরকে হত্যা করা হবে। কারণ সে যমীনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, মানুষ ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়। সুতরাং যমীনের বুকে তার বেঁচে থাকাটা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য বড় বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর। তাই তাকে হত্যা করা হলে তার ফিৎনা নির্মূল হবে এবং দেশ ও জাতি তার অনিষ্ট থেকে রেহাই পাবে।

বাজালা ইবনে আবদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি জায ইবনে মুআবিয়ার লেখক ছিলাম। অতঃপর আমাদের নিকট এ মর্মে উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিআল্লাহু আনহু) এর চিঠি আসল যে, তোমরা প্রত্যেক যাদুকর এবং যাদুকারিণীকে হত্যা করো। তিনি বলেন, তারপরআমরা তিনজন যাদুকরকে হত্যা করলাম।"

আর যাদুকরদের হত্যা করার ব্যাপারে সাহাবীদের ভেতরে কোন মতবিরোধ ছিলো না।

 যাদু প্রতিরোধের হুকুম: আর তা হলো, যাদুগ্রস্থ ব্যক্তিকে যাদু মুক্ত করা।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যাদুগ্রস্থকে যাদু মুক্ত করা দুই প্রকার। যথা:

(১) অনুরূপ যাদুর মাধ্যমে মুক্ত করা। আর তা হচ্ছে শয়তানের কাজ। এক্ষেত্রেই হাসান (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, "যাদুকরই কেবল যাদু মুক্ত করতে পারে।"

এতে যাদু প্রতিরোধকারী ও যাদু প্রতিরোধ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তি শয়তানের পছন্দের কাজ করে তার নিকটবর্তী হয়,ফলে সে যাদুগ্রস্থ ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব উঠিয়ে নেয়।

(২) বৈধ ঝাঁড়ফুক, দুয়া-দরুদ ও চিকিৎসার মাধ্যমে যাদু প্রতিরোধ করা; আর তা জায়েয।

* “যাদুকর, গণক ও জ্যোতিষীদের নিকট বিশ্বাস করা ব্যতিত শুধু তাদের কাছে গমন করা কবিরা গুনাহ। আর যে এমনটি করবে, চল্লিশ দিন তার সালাত কবুল করা হবে না। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে এবং তাকে কোন কিছু প্রশ্ন করবে, চল্লিশ দিন তার সালাত কবুল হবে না।” (সহিহ মুসলিম)

আর যদি তাদেরকে প্রশ্ন করে এবং সত্যায়ন করে, তবে সে আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওপর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকারকারী বিবেচিত হবে। কারণ হাকিম সহিহ সনদে হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কোন জোতিষি বা গণকের কাছে যায় এবং তার কথা বিশ্বাস করে সে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর ওপর নাযিলকৃত বিধানকে অস্বীকারকারীতে পরিণত হয়।”

ইসলাম ভঙ্গের অষ্টমকারণ, মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষ নেওয়া এবং তাদেরকে সাহায্য করা।

দলীল, আল্লাহ তাআলার বাণী,

“আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, নিশ্চয়ই সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।” (আল-মায়িদাঃ ৫১)

ইমাম ইবন হাযম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "এ আয়াত তার বাহ্যিক অর্থের উপর বহাল থাকবে যে, সে কাফিরদের মধ্য থেকে একজন কাফির। এটাই সত্য এতে দুজন মুসলিম মতভেদ করতে পারে না।" (আল মুহাল্লা, ১১ খন্ড, পৃঃ ৭১)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মাজমুউল ফাতওয়ার ১৮ খন্ডের ৩০০ পৃষ্ঠায় এই আয়াতের পরে বলেন,

{"হে ঈমানদাররা তোমরা ইহুদি খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না।"} এ আয়াত থেকে এ আয়াত পর্যন্ত {হে ঈমানদাররা তোমাদের মধ্য থেকে যারা দ্বীন থেকে ফিরে যাবে....}:

"ইহুদি খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করতে যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তাদেরকে দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে। আর এটা জানা বিষয় যে, তা উম্মতের সকল যুগের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর যেহেতু তিনি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন এবং এ বর্ণনা দিয়েছেন যে, সম্বোধিতদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে তারাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে তাই তিনি এ বর্ণনাও দিলেন যে, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে ও দ্বীন থেকে ফিরে যাবে সে ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এবং আল্লাহ অতিশীঘ্রই এমন সম্প্রদায় নিয়ে আসবেন যারা তাঁকে ভালবাসবে এবং তিনিও তাদেরকে ভালবাসবেন, তারা কাফিরদের বাদ দিয়ে মুমিনদের বন্ধু বানাবে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে ও কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না। যেমন তিনি প্রথমে (মক্কার মুশরিকদের ব্যাপারে) বলে দিয়েছিলেন যে, "যদি তারা তাকে (কিতাবের নিদর্শনাবলীকে) অস্বীকার করে তাহলে আমি তার জন্য এমন সম্প্রদায়কে নিযুক্ত করেছি যারা তাতে অস্বীকারকারী নয়।" (সূরা আনআম: ৮৯)

তো এরা যারা ইসলামে প্রবেশই করে নি এবং তারা যারা ইসলামে প্রবেশ করার পর তা থেকে বের হয়ে গিয়েছে, তারা ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না বরং আল্লাহ কেয়ামত পর্যন্ত এমন লোকদের প্রতিষ্ঠা করতে থাকবেন যারা তাঁর রাসূলের আনীত বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখবে এবং তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবে।"

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"মুসলিম যখন আল্লাহর সাথে শিরক করে অথবা শিরক না করে মুসলিমদের বিপক্ষে মুশরিকদের পক্ষ অবলম্বন করে তখন তার কাফির হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোরআন, হাদীস ও গ্রহণযোগ্য আহলে ইলমদের বক্তব্যে অসংখ্য দলীল রয়েছে (আর রাসায়েলুস শাখসিয়্যা, পৃঃ ২৭২)

শাইখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতিফ আলে শাইখ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যেমন দুরার আস সানিয়্যাহেএসেছে (১০/৪২৯),

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে টেনে আনবে কিংবা কোন প্রকার সাহায্য করবে তো সেটি স্পষ্ট দ্বীন ত্যাগ বলে বিবেচিত হবে।"

ইসলাম ভঙ্গের নবম কারণঃ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস করে যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর শরিয়াহ হতে কারো বের হওয়ার সুযোগ আছে, যেমন, মুসা (আলাইহিস সালাম) -এর শরিয়াহ হতে খিযির (আলাইহিস সালাম) বাইরে ছিলেন, তাহলে সে কাফির।

কারণ এ বিশ্বাস আল্লাহ তাআলার এ আয়াগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা আবশ্যক করে,

"আর এটাই আমার সহজ-সরল পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।" (আল-আনআমঃ ১৫৩)

"আর যে কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন অন্বেষণ করে, তা কখনোই তার নিকট হতে গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (আল-ইমরানঃ ৮৫)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দ্বীন সকল দ্বীনকে এবং তাঁর কিতাব সকল আসমানী কিতাবকে রহিত করে দিয়েছে। আর তাঁকে সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। সুতরাং যে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে না ও তাঁর অনুসরণ করবে না সে দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট এবং আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম নাসায়ী-সহ অন্যান্য ইমামগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, "রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একদিন উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাতে তাওরাতের একটি পাতা দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব এখনো কি সংশয়ে রয়েছ? আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট-স্বচ্ছ বিধান নিয়ে এসেছি। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আজ যদি মুসা (আলাইহিস সালাম) জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ করা ব্যতীত তাঁর কোন উপায় থাকত না।" (আহমাদ, বায়হাকী; সনদ হাসান)

ইসলাম ভঙ্গের দশম কারণঃ দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া এবং তা না শেখা ও সে অনুযায়ী আমল না করা।

দলীল আল্লাহ তাআলার বাণীঃ

"তার চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তিকে তার রবের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? নিঃসন্দেহে আমি অপরাধীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো। (আস-সাজদাহঃ ২২)

দ্বীন থেকে যে ধরনের বিমুখতাকে ইসলাম ভঙ্গের কারণ বলা যাবে তা হল, দ্বীনের মৌলিক বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া যার মাধ্যমে মানুষ মুসলিম হয় যদিও সে দ্বীনের বিস্তারিত বিষয় না জানে। কারণ আলেম ও তালিবুল ইলম ছাড়া অন্যরা দ্বীনের বিস্তারিত নাও জানতে পারে।

শাইখ সুলাইমান বিন সাহমান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

“মানুষ তখনই কাফির হয় যখন সে দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় যার মাধ্যমে কোন মানুষ ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করে। ওয়াজীব ও মুস্তাহাব বর্জন করার কারণে কাফির হয় না।”

শাইখ সুলাইমানের বক্তব্য “ওয়াজীব ও মুস্তাহাব বর্জন করার কারণে কাফির হয় না।” এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল এমন ওয়াজীব যা পরিত্যাগ করা গোনাহের কাজ, কুফুরী নয়। সব আমল বর্জন বা এ জাতীয় কোন কিছু তার উদ্দেশ্য নয় কারণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট সুনির্ধারিত মত হল কোন আমলকে পূর্ণ পরিত্যাগকারী কাফির। তেমনিভাবে অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেয়ীদের নিকট সালাত পরিত্যাগকারীও কাফির।

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) “মাদারিজুস সালিকীন” গ্রন্থে বলেন, “কুফরে আকবার পাঁচ প্রকার।”

অতঃপর তিনি তা উল্লেখ করে বলেন, আর দ্বীন থেকে বিমুখতার কুফুরী শ্রবণশক্তি ও অন্তর দিয়ে বিমুখতার কারণে হয়, সে তাঁকে সত্যায়ন করে না মিথ্যা পতিপন্নও করে না, তাঁকে বন্ধুও জানে না, শত্রুও জানে না এবং কখনো তাঁর কথা শ্রবণ করে না।”

দ্বীন থেকে বিমুখতার অর্থের এ বর্ণনা থেকে তুমি আমাদের এ যামানা ও পূর্ববর্তী যামানার অনেক কবরপূজারীদের বিধান বুঝতে পারবে। কারণ তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনীত বিষয় থেকে তাদের শ্রবণশক্তি ও অন্তর দ্বারা পূর্ণ বিমুখ। তারা কোন হিতকাঙ্ক্ষীর হিত কামনা বা পথ প্রদর্শনকারীর পথ প্রদর্শনের প্রতি মনোযোগী হয় না। আর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে এরাও কাফির।

আল্লাহ বলেন, “আর যারা কাফির তারা সতর্ককৃত বিষয় থেকে বিমুখ।”

পরিচ্ছেদ

বাধ্য করা ব্যতীত ভয়ে, ইচ্ছায় অথবা কৌতুক করে কুফরী করার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

দলীল আল্লাহর বাণী,

“যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে, ঐ ব্যক্তি বাদে যাকে বাধ্য করা হয় এমন অবস্থায় যে তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে প্রশান্ত, কিন্তু যে তার অন্তরকে কুফরের জন্য উন্মুক্ত করে দেয় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য রয়েছে ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে বিরাট আযাব। তা এই কারণে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।” (আন-নাহলঃ ১০৬-১০৭)

আল্লাহ তাআলা এখানে যাকে বাধ্য করা হয়েছে তবে তার অন্তর ঈমানের ব্যাপারে প্রশান্ত তাকে ছাড়া কাউকে ওযরগ্রস্থ ধরেন নি। চাই তার কাজ হোক ভয়ে, লোভে, তোষামোদ করে কিংবা দেশ, পরিবার, গোষ্ঠী বা সম্পদের টানে, অথবা তার কাজ হোক মজা করে বা অন্য কোন কারণে। তবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে ব্যতিত। আয়াত থেকে এটা দুভাবে বোঝা যায়,

১মঃ “ঐ ব্যক্তি ব্যতিত যাকে বাধ্য করা হয়” এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা যাকে বাধ্য করা হয় তাকে ব্যতিত কাউকেই বাদ দেন নি। আর এটা তো জানা বিষয় যে মানুষকে কোন কথা বা কাজেই বাধ্য করা যেতে পারে। মনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তো কাউকে বাধ্য করা যায় না।

২য়ঃ আল্লাহর বাণী, “তা এই কারণে যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে।” তো এখানে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিলেন যে, এই কুফর ও আযাব বিশ্বাস, অজ্ঞতা, দ্বীনকে ঘৃণা করা কিংবা কুফরকে পছন্দ করার কারণে নয়। বরং তার কারণ এর মাধ্যমে তার দুনিয়ার কিছু হিসসা অর্জন হবে তাই সে তাকে দ্বীনের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। আর আল্লাহই অধিক অবগত।”

পরিচ্ছেদ

কুফর দুই প্রকার

প্রথম প্রকার, যা মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। তা আবার পাঁচ প্রকার।

(১) মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কুফর:

দলীল: আল্লাহ বলেন,

“তার চাইতে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে (স্বয়ং) আল্লাহ তাআলার ওপরই মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, অথবা তার কাছে যখন সত্য এসে যায় তখন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে? (এ) কাফিরদের ঠিকানা কি জাহান্নামে নয়? (আনকাবুতঃ ৬৮)

সুতরাং কুরআন অথবা কুরআনের কিছু অংশ যদিও তা একটি আয়াত হোক অথবা প্রমাণিত সহীহ সুন্নাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কুফরে আকবার, যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে বের করে দেয়।

(২)বিশ্বাস করার পাশাপাশি অহংকার ও ঔদ্ধত্য করে বিরত থাকার কুফর:

দলীল: আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর (স্মরণ কর ঐ সময়ের কথা) যখন আমি বললাম ফিরিশতাদেরকে যে, তোমরা আদমকে সিজদা করো, অতঃপর তারা সিজদা করল শুধু ইবলিস ব্যতীত; সে সিজদা করতে অস্বীকার করল এবং অহংকার করল, আর সে (তখন) কাফিরদের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।” (আল-বাকারাঃ ৩৪)

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করতে অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করতে অহংকার প্রদর্শন করবে, সে কাফির এবং মুসলিম মিল্লাত থেকে বহিস্কৃত।

(৩) সন্দেহ পোষণের কুফর:

দলীল আল্লাহর বাণী,

“নিজের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করতে করতে সে নিজের বাগানে গিয়ে প্রবেশ করল এবং বলল, আমি ভাবতেই পারছি না যে এই বাগান কখনোও নিঃশেষ হয়ে যাবে! আমি মনে করি না একদিন কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমাকে যদি আমার রবের সামনে ফিরিয়েও নেয়া হয় তাহলে এর চাইতে উৎকৃষ্ট কোন প্রত্যাবর্তনস্থল আমি পাবো। তার কথার জবাব দিয়ে তার সঙ্গী বলল, তুমি কি সে মহান সত্তাকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে মাটি থেকে অতঃপর শুক্রকণা থেকে সৃষ্টি করেছেন, পরিশেষে তিনি তোমাকে মানুষের আকৃতিতে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। কিন্তু তিনি আল্লাহই হচ্ছেন আমার রব আর আমি আমার রবের সাথে কাউকে শরীক করি না।” (আল-কাহফঃ ৩৫-৩৮)

সুতরাং যে ব্যক্তি দ্বীনের কোন সর্বজনবিদীত বিষয় সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে যে নতুন মুসলিম হয়েছে, এখনো শরিয়াহর বিধান জানতে পারে নি অথবা দূরবর্তী কোথাও অবস্থান করে, যেখানে ইলম ও আলেমের অবস্থান নেই, ফলে তার পক্ষে জ্ঞান অর্জন করে মূর্খতা দূর করা সম্ভব নয়, সে ব্যতীত।

(৪) বিমুখতার কুফর:

দলীলঃ আল্লাহর বাণী,

"আর যারা কুফুরী করেছে যেসব জিনিস দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তা তারা থেকে বিমুখ।" (আল-আহকাফঃ ৩)

এর বিস্তারিত বিবরণ ইসলাম ভঙ্গের কারণের মাঝে গিয়েছে।

(৫) কপটতা বা নিফাকের কুফর:

দলীল আল্লাহর বাণী,

"এটা এ কারণেই যে, এরা ঈমান আনার পর কুফরী অবলম্বন করেছে, ফলে তাদের অন্তরে সীল মেরে দেয়া হয়েছে, ফলে তারা কিছুই বুঝতে পারছে না।" (আল-মুনাফিকুনঃ ৩)

আর নিফাক হচ্ছে ঈমান প্রকাশ করা ও কুফরীকে গোপন করা।

কুফুরীর দ্বিতীয় প্রকার: যা কুফরে আসগর বা ছোট কুফর। যা মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

তা ওই সকল বিষয়, যা শরিয়াহর কুফর হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে কিন্তু বড় কুফরের সীমায় পৌঁছায় নি। যেমন- নিয়ামতকে অস্বীকার করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আল্লাহ তাআলা এমন একটি জনপদের উদাহরণ উপস্থাপন করছেন যা ছিল নিরাপদ ও প্রশান্তিময়, তাদের কাছে রিযিক আসতো সকল দিক থেকে স্বাচ্ছন্দে অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করল, ফলে তারা যে আচরণ করত, তার শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তাদের ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক পরিয়ে শাস্তি দিলেন।" (আন-নাহলঃ ১১২)

এছাড়া কারও বংশ সূত্রে অপবাদ দেয়া, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা ছোট কুফর। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "আমার উম্মাহর মাঝে দুই ধরনের কাজ কুফরী, (ক)বংশ সূত্রে অপবাদ দেয়া এবং (খ) মৃতের জন্য উচ্চ স্বরে বিলাপ করা।"

আরো উদাহরণ যেমন, কোন মুসলিমকে হত্যা করা। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকি এবং হত্যা করা কুফরী।"

পরিচ্ছেদ

নিফাকের প্রকারভেদ

নিফাক দুই প্রকার। বড়, ছোট।

নিফাক বা কপটতার আভিধানিক অর্থ:

বাহ্যিক অবস্থা ভেতরের অবস্থার বিপরীত হওয়া অথবা কোন জিনিস প্রকাশ করা ও এর বিপরীত গোপন করা।

শরয়ী পরিভাষায় নিফাক:

ঈমান প্রকাশ করা ও কুফরী গোপন করা।

বড় নিফাক:

এ নিফাক ধারনকারীকে জাহান্নামের তলদেশে নিক্ষেপ করা হবে, এর অনেক প্রকার রয়েছে যার কিছু বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নিফাক আর কিছু কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নিফাক যা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। এরকম উল্লেখযোগ্য কিছু নিফাক হলঃ

বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নিফাকঃ

১ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অথবা তাঁর আনীত বিধানের কোন কিছুকে অস্বীকার করা।

২ – রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অথবা তাঁর আনীত বিধানের কোন কিছুকে ঘৃণা করা।

৩ - দ্বীনের ক্ষতিতে আনন্দিত হওয়া অথবা দ্বীনের বিজয়কে অপছন্দ করা।

৪ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রদত্ত সংবাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করাকে আবশ্যক মনে না করা।

৫ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রদত্ত নির্দেশের আনুগত্য করা আবশ্যক মনে না করা।

কর্মের সাথে সম্পৃক্ত নিফাকঃ

৬ - রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে কষ্ট দেয়া, দূর্নাম করা ও নিন্দা করা।

৭ - কাফিরদের পক্ষ নেয়া ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করা।

৮ - আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ঈমান আনা ও তাদের আনুগত্য করার কারণে মুমিনদের নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা।

৯ - আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধানকে উপেক্ষা করা ও তার থেকে বিমুখ হওয়া।

ছোট নিফাক পাঁচ প্রকার: যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, তিনি বলেন,

"মুনাফিকের আলামত তিনটি, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।" অন্য বর্ণনায় এসেছে, "যখন সে ঝগড়া করে (গালিগালাজের মাধ্যমে) পাপাচার করে এবং চুক্তি করলে বিশ্বাস ঘাতকতা করে।"

বড় নিফাক ও ছোট নিফাকের মাঝে পার্থক্য:

১ - বড় নিফাক মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয়, কিন্তু ছোট নিফাক মুসলিম মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না।

২ - বড় নিফাক কোন মুমিন থেকে প্রকাশিত হতে পারে না, কিন্তু ছোট নিফাক মুমিন থেকে প্রকাশিত হতে পারে।

বড় নিফাককারীকে সরাসরি মুনাফিক বলা যাবে পক্ষান্তরে যে ছোট নিফাকের কোন কাজ করেছে তাকে সরাসরি মুনাফিক বলা যাবে না। তার ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু বলা যাবে যে, তার মাঝে নিফাকীর দোষ রয়েছে।

ঈমানের ভিত্তিসমূহ

প্রথম;

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা। যার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে।

দ্বিতীয়;

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা,

আর তা হলো এই দৃঢ় বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাগণ আছেন, তারা নূরের তৈরী, তারা আল্লাহর সম্মানিত বান্দা, রাত-দিন সর্বদা তারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন, এতে তারা কখনো ক্লান্তি অনুভব করেন না। আল্লাহ তাআলা তাদের যে নির্দেশ করেন সে ক্ষেত্রে তারা তাঁর অবাধ্য হন না। তাদেরকে যা করতে আদেশ করা হয় তাই করেন। তারপর তারা মানুষের মত নন, তারা খাওয়া-দাওয়া করেন না, ঘুমান না ও বংশ বিস্তার করেন না। তারা বিভিন্ন দ্বায়িত্ব পালনে রত রয়েছেন যেগুলো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পালনের দ্বায়িত্ব দিয়েছেন।

ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা দুই প্রকার সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত ঈমানঃ ফেরেশতাগণ আল্লাহর বান্দা, যারা নূর হতে সৃষ্ট, যারা কখনো তাঁর অবাধ্য ও তাঁর আনুগত্যে অবাধ্য হন না।

বিস্তারিত ঈমানঃ

কুরআন ও সুন্নাহ তে তাদের ব্যাপারে যে বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন, তাদের কাজ ও কারো কারো নাম এবং আল্লাহ তাদের কাউকে যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফিল, আরশবহণকারীফেরশতা, মৃত্যুরফেরেশতা, জাহান্নামের পাহারাদার ফেরেশতা মালেক।

তৃতীয়;

আসমানী গ্রন্থসমূহের প্রতি ঈমান আনা,

এখানে কিতাব দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঐ সকল কিতাব যা আল্লাহ তাঁর রাসূলদের ওপর নাযিল করেছেন।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনা দুই প্রকার,সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত ঈমান:

সংক্ষেপে এতটুকু বিশ্বাস রাখা যে আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) প্রতি বিভিন্ন কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু তিনি তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন আর কিছু তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেন নি।

বিস্তারিত ঈমান:

কোরআন বা সুন্নাহে যে সকল কিতাবের আলোচনা এসেছে যে তা কোন নির্দিষ্ট রাসূলের নিকট ওহীরূপে প্রেরণ হয়েছে তার প্রতি নির্দিষ্টভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা ওয়াজিব। যেমন; কুরআন, ইঞ্জিল, তাওরাত, যাবুর, মুসা (আলাইহিস সালাম) ও ইব্রাহীম(আলাইহিস সালাম) এর সহিফাসমূহ।

এ সকল কিতাব সমূহের প্রতি উল্লেখিত পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে ঈমান আনয়ন করা ওয়াজিব।

চতুর্থ;

নবীও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা,

আর তাহলো এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস করা ও স্বীকৃতি দেয়া যে,আল্লাহ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে বিভিন্ন রাসূল প্রেরণ করেছেন।

নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান ও দুই প্রকার,সংক্ষিপ্ত ঈমান,বিস্তারিত ঈমান।

সংক্ষিপ্ত ঈমান:

সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ তাআলার প্রেরিত সকল নবী ও রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

বিস্তারিত ঈমান:

কুরআন ও হাদিসে উল্লেখিত সকল নবী ও রাসূল (আলাইহিমুস সালাম) এর প্রতি ও তাদের দাওয়াতের যে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে তার প্রতি ঈমান আনা।

সুতরাং তাদের প্রতি ও কোরআন ও সহিহ হাদীসে তাদের সম্পর্কে যে আলোচনা এসেছে তার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক।

পঞ্চম;

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনা,

আর তা হচ্ছে হিসাব গ্রহণের জন্য মৃত্যুর পর সকল সৃষ্টির পুনরুত্থান।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনাও দুই প্রকার, সংক্ষিপ্ত, বিস্তারিত।

সংক্ষিপ্ত ঈমান:

মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি এবং হিসাবের জন্য আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার প্রতি ঈমান আনা এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনা।

বিস্তারিত ঈমান:

পুনরুত্থান ও কেয়ামতের দিন যে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে তার প্রতি ঈমান। সেগুলোর আলোচনা কোরআনে ও সহিহ হাদীসে যেমন বিস্তারিতভাবে এসেছে তেমন ভাবে ঈমান আনা, যেমন পুলসিরাত, মিযান, আমলনামা উড়তে থাকা ও সূর্য সৃষ্টির নিকটবর্তী হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে ঈমান আনা। অনুরুপভাবে কবর এবং তার নিয়ামতসমূহের প্রতি ঈমান আনা। কারণ তা শেষ দিবসের অন্তর্ভুক্ত।

উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে প্রমাণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কবর আখেরাতের প্রথম ধাপ।” (মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ; সনদ হাসান)

ষষ্ঠ;

তাক্বদীরের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান,

আর তা এটা স্বীকার করার মাধ্যমে হবে যে, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এবং সবার ভাগ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সবকিছুই তাঁর ইচ্ছার আওতাধীন। আর তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন, যা ইচ্ছা তাই করেন। তিনি যা চান তা হয়, আর তিনি যা চান না তা হয় না। তাঁর হাতেই সব কিছুর রাজত্ব। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাবান। আপন অনুগ্রহে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন পথপ্রদর্শন করেন এবং ন্যায়পরায়নতার সাথে তিনি যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন, আর তার বিধান ও সিদ্ধান্তকে পরিবর্তনকারী কেউ নেই। তিনি সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের কর্ম, রিযিক, জীবন ও মরণ নির্ধারণ করেছেন।

ইসলামের আরকান বা ভিত্তিসমূহ

ইসলামের আরকান পাঁচটি। যথা:

১। এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

২। সালাত কায়েম করা।

৩। যাকাত প্রদান করা।

৪। রমযানের সিয়াম পালন করা এবং

৫। সক্ষম ব্যক্তির জন্য বাইতুল্লাহর হজ্ব করা।

বিদআত

শাব্দিক অর্থে: নতুন ও নব্য সৃষ্ট বিষয় যার পূর্বে কোন উদাহরণ নেই।

আবুল বাকা আল কাফাবী বলেন, বিদআত প্রত্যেক ওই সকল কাজ, যার পূর্ববর্তী কোন দৃষ্টান্ত নেই। বিদআত শব্দ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে আল্লাহ তাআলার এ বাণী:

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ

"(তিনি) পূর্ববর্তী কোন উদাহরণ ব্যতিত আসমান ও যমীন কে সৃষ্টিকারী।"

(আল-বাক্বারাঃ১১৭,আল-আনআমঃ১০১)

শরয়ী পরিভাষায়: ইমাম শাতেবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

"বিদআত শরয়ী পন্থার অনুরূপ দ্বীনের নব্য সৃষ্ট পন্থা যা অনুসরণ করে শরয়ীপন্থা অনুসরণের সাওয়াব আশা করা হয়।"

সংজ্ঞার বিশ্লেষণ: "দ্বীনের পন্থা"

এ কথার মাধ্যমে দুনিয়াবী ও স্বভাবগত বিষয় বের হয়ে যায়।

"নব্যসৃষ্ট" অর্থাৎ নতুন, নব উদ্ভাবিত।

"শরয়ীপন্থার অনুরূপ" অর্থাৎ শরয়ী পন্থার মত।

"যা অনুসরণ করে শরয়ীপন্থা অনুসরণের সাওয়াব আশা করা হয়" অর্থাৎ সে পন্থা অবলম্বনকারী আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের আশা করে যেমন শরয়ী পন্থার অনুসারী আশা করে।

আর বিদআত হলো দ্বীনের নব্য আবিষ্কার এবং মুমিনদের পথ থেকে বিচ্যুতি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

“আর এটাই আমার সহজ-সরল পথ। তোমরা এ পথেই চলো এবং অন্য পথে চলো না। কারণ তা তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে।” (আল-আনআমঃ ১৫৩)

তো সিরাতুল মুস্তাকীম হল আল্লাহর পথ, যার দিকে তিনি আহবান করেছেন এবং তা আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পথ।

আর “বিভিন্ন পথ” হল সিরাতুল মুসতাকীমের পথ থেকে বিচ্যুত, মতভেদ সৃষ্টিকারী তথা বেদাতীদের পথ।

বিভিন্ন পথ দ্বারা পাপকাজের পথ উদ্দেশ্য নয়। কারণ পাপ কাজ হিসেবে পাপ কাজের পথকে কেউ শরয়ী পথের সাদৃশ্যপূর্ণ করে চলার জন্য তৈরি করেনি। এ গুণটি শুধুমাত্র বিদআত ও নব সৃষ্ট বিষয়ের সাথেই খাস। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত হাদীস তা প্রমাণ করে, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের সামনে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বলেন, “এটা আল্লাহর রাস্তা। অতঃপর তিনি এর ডানে বামে অনেক রেখা টানলেন এবং বললেন, এগুলো বিভিন্ন পথ যার প্রতিটির সামনেই রয়েছে শয়তান, যে ওই পথের দিকে আহবান করছে।” অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন, (“নিশ্চয়ই এটা আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো।”)। (আহমাদ, নাসায়ী, দারেমী, সনদ হাসান)

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত,

“তোমরা বিভিন্ন পথের অনুসরণ কর না”। তিনি বলেন, “তা হলো বিদআত এবং সংশয় সমূহ।”

আয়শা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন,

“যে আমাদের এ বিষয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা পরিত্যাজ্য।” (বুখারী, মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় এসেছে, “যে ব্যক্তি এমন আমল করবে, আমাদের বিষয় (শরিয়াহ) যার উপর নয়, তবে তা পরিত্যাজ্য।”

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মানুষের মাঝে খুতবা দিতেন এবং খুতবায় বলতেন,

“সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হলো নবসৃষ্ট বিষয়, আর প্রত্যেক নবসৃষ্ট বিষয়ই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী।"

ইমাম নাসায়ী সহিহ সনদে আরো বৃদ্ধি করে বলেছেন, “আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণতিই জাহান্নাম।”

ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, “সুন্নাহর মাঝে মধ্যম পরিশ্রম করা বিদাআতের মাঝে অনেক পরিশ্রম করা থেকে উত্তম।”

পরিচ্ছেদ

বিদআত তার সম্পৃক্ত বিষয়ের দিক থেকে তিন প্রকার।

প্রথম: বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত বিদআত:

যেমন, আল্লাহ তায়ালার গুনাবলী কে অস্বীকার করা অথবা বিকৃত করার বিদআত বা কাদেরিয়া ও জাবরিয়াদের বিদআত।

দ্বিতীয়: কর্মের সাথে সম্পৃক্ত বিদআত:

যেমন, শবে বরাতে রাত্রি জাগরণ করা।

তৃতীয়ঃ বর্জন করার সাথে সম্পৃক্ত বিদাআতঃ যেমন, সফর মাসে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা।

পরিচ্ছেদ

হুকুমের দিক থেকে বিদআত দুই প্রকার:

এমন বিদআত যা মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয়: যেমন রাফিদীদের বিদআত ও জাহমিয়াদের বিদআত।

এমন বিদআত যা মানুষকে ফাসিক বানিয়ে দেয়: তা হচ্ছে ঐ সকল বিদআত, যা কুফরের সীমায় পৌঁছায় না।

সকল প্রকারের বিদআতই হারাম। ইসলামে বিদআতে হাসানাহ বলতে কিছু নেই। বরং বিদআতের সকল প্রকারই গোমরাহী, যেমন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন।

পরিচ্ছেদ

বিদআত মৌলিক হয় আবার আপেক্ষিকও হয়।

মৌলিক বিদআত: শরিয়াহতে যার কোন ভিত্তি নেই এবং যা সামগ্রিকভাবে বা বিস্তারিতভাবে কোন ভাবেই দলীল বা দলীলের সদৃশও নির্ভর নয় যেমন, ঈদে মিলাদুন্নবী। এটা এমন এক বিদআত, যার না সামগ্রিকভাবে কোন ভিত্তি আছে আর না তার মাঝে ঘটা বিদআত সমূহের বিস্তারিত কোন দলীল আছে।

আপেক্ষিক বিদআতঃ এটা এমন বিদআত, যার মূল ইসলামে বিদ্যমান কিন্তু তাতে অন্য কোন দিক থেকে সমস্যা অনুপ্রবেশ করেছে।

বৈধ কাজে সমস্যার অনুপ্রবেশ ছয় দিক থেকে হয়:

পদ্ধতিগত:

যেমন সকলে জমায়েতবদ্ধ হয়ে সমবেত কন্ঠে যিকির করা অথবা যিকিরের সময় নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মাথা বা শরীর দোলানো। তো যিকির করা মৌলিকভাবে বৈধ কিন্তু এখানে পদ্ধতিতে বিদআত অনুপ্রবেশ করেছে।

কারণগত:

বৃষ্টির সময়ে সালাত র্নিদিষ্ট করা।

জাতগত:

যেমন কুরবানীর জন্য চতুষ্পদ জন্তু (উট, গরু, ছাগল.....) ইত্যাদি জন্তুকে শরিয়াহ নির্ধারণ করেছে। সুতরাং যদি কেউ মুরগী বা হরিণ কুরবানী করে তবে সে বিদআত করল, যেহেতু সে শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত জাতের মাঝে যা শরিয়াহ কর্তৃক নির্ধারিত নয় তার অনুপ্রবেশ করাল।

সংখ্যা অথবা পরিমাণগত:

যেমন নির্দিষ্ট যিকিরকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় নির্ধারণ করা যা শরিয়াহ নির্ধারণ করেনি। এবং তা মেনে চলা।

সময়গত:

যেমন, জুমআর রাতকে জাগরণের জন্য বা তার দিনকে সিয়ামের জন্য নির্দিষ্ট করা।

স্থানগত:

গুহা বা পরিত্যাক্ত স্থানে ইতিকাফ করা।

আর আল্লাহ তাআলাই অধিক অবগত।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর পরিবার-পরিজন ও তাঁর সকল সাহাবাদের প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষিত করুন।